KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর্ ওয়ারসন
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫১/৫ ৫১/৬ ৫১/৭ ৫১/৮	Year of Publication ভাদ্র ১৩৯৭ ‖ Sep 1990 আশ্বিন ১৩৯৭ ‖ Oct 1990 কার্তিক ১৩৯৭ ‖ Nov 1990 অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ ‖ Dec 1990
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C. D. Roll No : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ৭ নভেম্বর ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

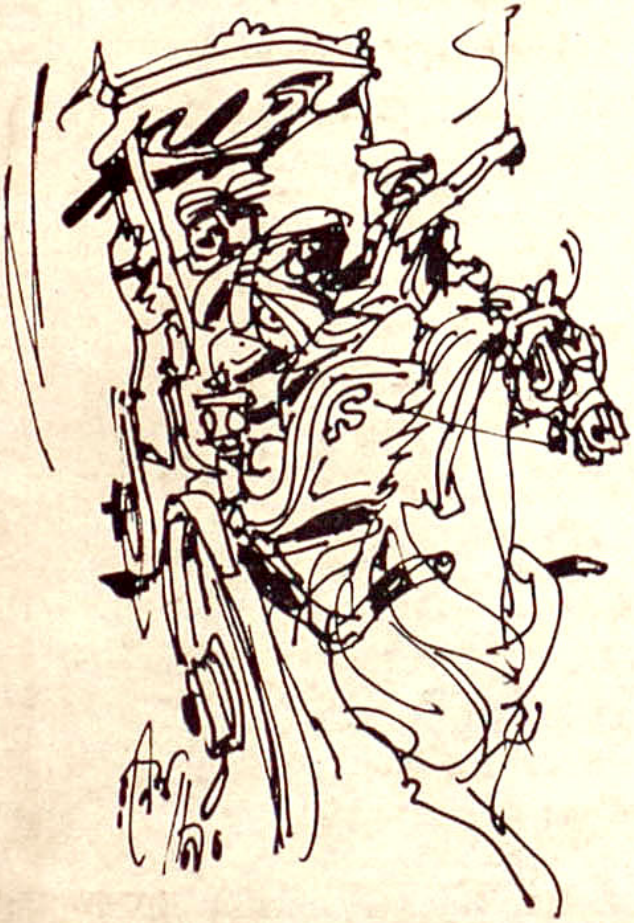

সমাজতন্ত্রের বর্তমান সংকটাবস্থা যে তত্ত্বগতভাবে অজানা কোনো ব্যাপার নয়, "সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ" নিবন্ধে খ্যাতনামা মার্কসবাদী লেখক বদরুদ্দীন উপরের প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই।

ভারতীয়ত্ব যখন জাতপাতের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ, তখন স্বাভাবিকভাবেই জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আচার্য সুনীতিকুমারের ভারতচেতনার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—যা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে লিখেছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত। এই সঙ্গে মুদ্রিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত রচনা।

সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে একটি গ্রন্থের আলোচনা করেছেন অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ।

"দিল্লির সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন—প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে"—লিখেছেন গার্গী চক্রবর্তী।

ইতিহাসকে জানার আগে ঐতিহাসিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা যে অত্যন্ত জরুরি—এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জগদীশনারায়ণ সরকারের একটি গ্রন্থের আলোচনা।

"শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ইসলাম"—অত্যন্ত সময়োপযোগী এই প্রসঙ্গটির তথ্যবহুল বর্ণনা দিয়েছেন ড· তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এবং কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুর্লভ বন্ধুত্বের যে নিবিড় সম্পর্ক পরস্পরের কাছে নিরন্তর প্রেরণার উৎস ছিল—তার তথ্যসমৃদ্ধ আলেখ্য রচনা করেছেন অসীম মুখোপাধ্যায়।

প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

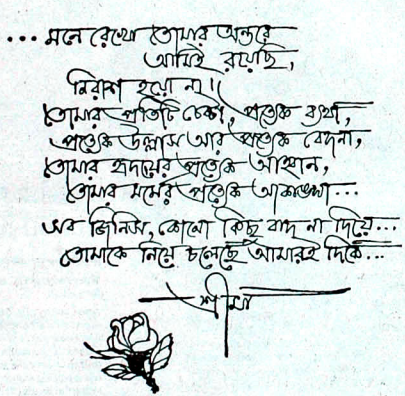

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ৭
নভেম্বর ১৯৯০
কার্তিক ১৩৯৭

সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বদরুদ্দীন উমর ৫০৩
সুনীতিকুমারের ভারত-চেতনা সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৫১২
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত রচনা ৫৩০
জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অসীম মুখোপাধ্যায় ৫৩৮

নীলজল সুনীলকুমার নন্দী ৫১৫
জন্মসূত্র সমর চক্রবর্তী ৫১৬
আবহমান স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় ৫১৭
বাঁচো, বেঁচে থাকো কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ৫১৮

বেশরম সাদাত হোসেন মনটো / অনুবাদ কিরণশঙ্কর মৈত্র ৫৩২

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৫৪৮
দিল্লীর সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন—প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে গার্গী চক্রবর্তী
শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ইসলাম তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থসমালোচনা ৫৫৮
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, গৌতম নিয়োগী,
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কান্তি গুপ্ত

স্মরণে ৫৭১
প্রফুল্লদার কথা শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদেশী সাহিত্য ৫৭৭
অক্টাভিয়ো পাৎস : ভাবনাসূত্র ও কয়েকটি কবিতা কমলেশ চক্রবর্তী

মতামত ৫৮৩
শক্তিনাথ ঝা, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার দত্ত

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২১-৬৩২৭

বাংলা ভাষার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ

শিশু সাহিত্য সংসদ • সাহিত্য সংসদ

চল্লিশে পৌঁছল

১৯৫১—১৯৯০

চল্লিশ বছরে আমাদের প্রকাশনার প্রধান স্বকীয়তা

শিশুর আনন্দময় সাম্রাজ্য

পড়তে শেখার আগেই, মায়ের কোলে দোল-খাওয়া শিশু আমাদের ছড়ার বই থেকেই প্রথম জানতে পারে বই ব্যাপারটা ভয়ের নয়, এর মধ্যে আছে অজস্র রঙ রূপ আনন্দ। তারপর বর্ণপরিচয়ের আয়োজন, 'ছড়া ছবিতে অ আ ক খ', 'হাসিখুসি' থেকে 'নিজে পড়', 'নিজে শেখ'। কোল আর হামাগুড়ি ছেড়ে শিশুর সঙ্গে চিরকাল চলছে আমাদের দৃশ্যময় রামায়ণ, মহাভারতের গল্প, নীতিমালা, আমরা বাঙালী, আকাশ ভরা সূর্যতারা আর শৈশবের উজ্জ্বল স্মরণের অ্যালবাম 'আমার শৈশব' তো আছেই।

অভিধান গ্রন্থমালা

১৯৫৭ সালে 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' প্রকাশ থেকে আমাদের অভিধান প্রকাশনা শুরু। সেই থেকে নানা ধরনের English-Bengali বা Bengali-English Dictionary-র মতো নিত্যসহায়ক অভিধান প্রকাশ করা ছাড়াও আমাদের তালিকায় আছে আরও তিনটি অভিনব মৌলিক সংগ্রহ। 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান', 'সংসদ সমার্থশব্দকোষ' এবং 'সংসদ ব্যাকরণ-অভিধান'।

চিরায়ত সাহিত্য সম্ভার

বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী লেখকদের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগে আমরা এখনও পর্যন্ত প্রকাশ করেছি বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্রের রচনা সম্ভার। সেইসঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী, তন্ত্রের কথা, উপনিষদের কথা, ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যও আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে থেকেছে সবসময়।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড • কলকাতা-৭০০ ০০৯

সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

বদরুদ্দীন উমর

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা এখন সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদের এজেনটরা, বুর্জোয়াদের স্বার্থ-রক্ষাকারীরা এই প্রচারণার সাথে তাল মিলিয়ে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারকার্য অব্যাহত রেখেছে। এই প্রচার-প্রচারণার মূল বক্তব্য হল : একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের কোনো গ্রাহ্যতা এবং কার্যকারিতা আর নেই ; বিশেষ এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমাজ-তন্ত্রের উদ্ভব আর বিকাশ হলেও একটি সমাজব্যবস্থা হিসেবে তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে শেষপর্যন্ত তার মধ্যে ভাঙন এসেছে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে যা-কিছু বোঝায়, তার অবসান ঘটেছে। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বুর্জোয়া প্রচারণা যে পর্যায়ে গেছে এবং যে আকারে হচ্ছে, তার কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত নেই।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময় থেকেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্য-বাদী প্রচার-প্রচারণা একটানা চলে এলেও, তখন রাশিয়া এবং পূর্ব-ইউরোপ, চীন ইত্যাদি দেশে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিও একটানা ভাবে জারি থাকার ফলে তাদের প্রচারণার ধার অনেক ভোঁতা এবং প্রভাব যথেষ্ট সীমিত ছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং ১৯৮৯ সালে পূর্ব-ইউরোপে যেসব পরিবর্তন দ্রুত সাধিত হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার প্রভাব, এবং সেই প্রচারের দ্বারা সৃষ্ট বিভ্রান্তি এখন আগের যে-কোনো সময়ের থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এই প্রচারণার ফলে সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে, এমনকী প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে তারও কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত নেই।

এই হতাশার কারণ একদিকে ধনতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, শাসন এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রবল তাগিদ, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগেকার নিশ্চিত ধারণার পরিবর্তে সন্দেহ, এমনকী সমাজতন্ত্রের কার্যকারিতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ অবিশ্বাস। এই সন্দেহ আর অবিশ্বাসের প্রকৃত কোনো ভিত্তি না থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব-ইউরোপ আর চীনের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যমগুলির দ্বারা যেভাবে পরিবেশিত হচ্ছে, এবং তার পালটা প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয়

মাধ্যমসমূহ যেভাবে অনুপস্থিত রয়েছে, তার ফলে জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে উল্লিখিত বিভ্রান্তি খুবই স্বাভাবিক।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে কুসংস্কার স্বাভাবিক। কিন্তু এই 'স্বাভাবিকতা'র কারণে কুসংস্কারকে স্বীকার ক'রে তাকে শিরোধার্য করার এবং তার বশবর্তী থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ঠিক তেমনই জনগণ এবং রাজনৈতিক কর্মীরা একনায়কত্বমূলক সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার শিকার হয়ে যদি সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হন, তাঁদের মধ্যে হতাশার আর নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা যতই স্বাভাবিক হোক, তাকে স্বীকার করে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব-শোষণ-নির্যাতন-ব্যবস্থার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার, তাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষেও কোনো সত্যিকার যুক্তি নেই। এক্ষেত্রে যা করা দরকার তা হল: সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব-ইউরোপ, চীন ইত্যাদি এককালীন সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্প্রতি যেসব পরিবর্তন এসেছে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রাথমিক ঐতিহাসিক পর্যায়ে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলির বৈজ্ঞানিক, মার্কসবাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যথাযথভাবে করা, এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা। এই কাজটি ঠিকমতো সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে সহজেই দেখানো যাবে যে, সমাজতন্ত্র কোনো একটি দেশের বা অঞ্চলের, এমনকী একাধিক দেশেরও বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নয়। তা হল সর্বাংশে একটি বিশ্বব্যবস্থা, যার উদ্ভব এবং বিকাশ কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে ঘটে থাকে, যার উপর কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা দেশের কোনো বিশেষ এখতেয়ার নেই। ঠিক যেমনটি ধনতন্ত্রের উদ্ভব এবং বিকাশের ক্ষেত্রেও তা ছিল না।

ঐতিহাসিক বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের পরবর্তী এবং সে কারণে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের পরই ঘটার কথা। সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণ ক'রে, তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আর সংকটের মূলদিকগুলি নির্দেশ ক'রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের নিয়মাবলী সূত্রবদ্ধ করতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথমে সবথেকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে—যেমন ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশেই ঘটবে। পরবর্তী কালে দেখা গেল যে, উন্নত ধনতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত, দেশগুলিতে বিপ্লব ঘটার পরিবর্তে ১৯১৭ সাল থেকে একের পর এক যেসব দেশে বিপ্লব ঘটল সেগুলি (বিশ্বযুদ্ধের বিশেষ পরিস্থিতিতে জার্মানি আর চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া) উন্নত এবং শিল্পায়িত ধনতান্ত্রিক দেশ নয়, উপরন্তু সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত, এমনকী নিয়ন্ত্রিত, অনুন্নত পশ্চাৎপদ দেশ।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের পরিবর্তে কতকগুলি পশ্চাৎপদ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব তথা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ শুরু করার মতো পরিস্থিতি একদিকে ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হওয়া, পরদেশলুণ্ঠনের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের সংকট সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হওয়া, এবং অন্যদিকে বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পর্কিত দেশীয় শোষক-শাসকশ্রেণী সমাধানের অযোগ্য সংকটে নিপতিত হওয়া, এবং সেইসঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের আর বুর্জোয়া-শ্রেণীর একটি ভেঙে আসা অংশের যৌথ শক্তির বৃদ্ধির ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে বিকাশের যে নতুন নিয়মসমূহের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেগুলির বিশ্লেষণ আর তার ফলাফল সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করা মার্কসের পক্ষে সম্ভব ছিল না; কারণ, মার্কসের এবং এঙ্গেলসের জীবদ্দশায় ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর তেমন ঘটে নি। সেটা ঘটেছিল লেনিনের আমলে, এবং সে কারণেই স্তালিন লেনিনবাদকে আখ্যায়িত করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদ হিসেবে।

মার্কস বলেছিলেন: উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ-

গুলিতে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সংকট পরিপক্ক হওয়া, সংকটনিরসনের কোনো পথ খোলা না থাকা, এবং প্রোলেতারিয়েত একটি সুসংগঠিত, তাত্ত্বিকভাবে সুসজ্জিত এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন- ও বণ্টন-সম্পর্ককে উৎখাত করার মতো অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরিস্থিতিতেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব সংঘটিত হবে। মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, ১৯৪৪-৪৫ সালে পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে বিপ্লব, ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লব ইত্যাদির ফলে মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি। উন্নত ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঠিক সেই-ভাবেই ঘটবে যেভাবে মার্কস বলেছিলেন। কিন্তু তার পূর্বে অনুন্নত কিছু দেশে ইতিমধ্যে বিপ্লব সংঘটিত হওয়া এবং অন্য-কিছু দেশে সেই ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে থাকা যে ঐতিহাসিক নিয়ম অনুযায়ী সম্ভব হয়েছে আর হচ্ছে, সেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সূত্রায়ণ মার্কসবাদী বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুযায়ীই সম্ভব।

লেনিন ঠিক তা-ই করেছিলেন। পশ্চাৎপদ দেশে, রাশিয়ার মতো দেশে, জার্মানির আগে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খল যেখানে কতকগুলি সুনিদিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, সেখানেই সৃষ্টি হয় বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, এবং সম্ভাবনা দেখা দেয় বিপ্লব বাস্তবত সংঘটিত হওয়ার।

ধনতন্ত্রের বিকাশও অবাধ হয় নি

ধনতন্ত্রের কতকগুলি বিশেষ ও নিজস্ব নিয়মাবলী আছে, যেগুলিকে আবিষ্কার, বিশ্লেষণ এবং সূত্রবদ্ধ করা যায়। মার্কস সে কাজটিই করেছিলেন ধনতন্ত্রের বিকাশের এমন এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে যখন ধনতন্ত্র তার বিকাশের এক উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার আগে ধনতন্ত্রের বিকাশ শুরু হলেও তার উপর প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়মকানুন প্রভাব বিস্তার করত, ধনতান্ত্রিক নিয়মগুলির কার্যকারিতা খর্ব করত, এমন-কী ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রবল বাধার সৃষ্টি করত। এরকমটি ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রাথমিক স্তরে সর্বক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এমনকী ইউরোপে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের থেকে ১৮৭১ সালের পারিকমিউন পর্যন্ত এক বিস্তৃত ঐতিহাসিক পর্যায়ে ফরাসি সমাজের বিকাশধারার মধ্যেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়মকানুন ধ্যানধারণা ইত্যাদির প্রভাব ধনতন্ত্রের প্রক্রিয়ার মধ্যে নানা জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

এটাই স্বাভাবিক। কারণ, একটি ব্যবস্থা থেকে অন্য-একটি ব্যবস্থার উদ্ভব যখন ঘটে বা ঘটতে থাকে, তখন নতুন ব্যবস্থাটি মাটি ফুঁড়ে অথবা আকাশ থেকে নেমে এসে একটি পরিপক্ক ব্যবস্থা হিসেবে তার সকল নিয়মকানুন নিয়ে আবির্ভূত হয় না। একটি নতুন ব্যবস্থার মৌলিক নিয়মাবলীর আবির্ভাব যথাযথভাবে ঘটতে সময় লাগে এবং পূর্ববর্তী ব্যবস্থার সঙ্গে কখনো প্রবল প্রকাশ্য সংঘর্ষ এবং কখনো বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তা বিলম্বিত হয়ে থাকে। ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বত্র এটা দেখা গেছে।

কিন্তু শুধু ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রেই নয়। দাসব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সামন্তব্যবস্থার আবির্ভাব এবং প্রতিষ্ঠার কালেও এই একই ধরনের টানাপোড়েন ঘটেছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ব্যবস্থার প্রভাব পরবর্তী ব্যবস্থার উপর বেশ কিছু কাল ধরে কার্যকর থেকেছে, এবং তার পরিণতিতে নতুন ব্যবস্থার নিয়মাবলীর বিকাশ নানা-ভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

১৯১৭ সালে যে-রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল সেটি ছিল একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল সাম্রাজ্যবাদী দেশ; কিন্তু তা সত্ত্বেও রুশ সমাজ তখন প্রায় সবদিক থেকেই ছিল ভয়ানক পশ্চাৎপদ। এ ধরনের একটি পশ্চাৎপদ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করার পর

তাদেরকে অনিবার্যভাবে ধনতন্ত্রের কতকগুলি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হয়, যেগুলি না করে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ যথাযথভাবে শুরু করা বা তার ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয় না। এসব কাজের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, উৎপাদনের সামাজিকীকরণ। ঐতিহাসিকভাবে ধনতন্ত্রই উৎপাদনের সামাজিকীকরণ করে থাকে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়ায় একটি বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে উৎপাদনের সামাজিকীকরণের এই প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিবেচনা করেই মার্কস ধনতন্ত্রের বিশ্লেষণ করে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। কারণ, ধনতান্ত্রিক সামাজিক উৎপাদন এবং উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্যে যে ব্যবস্থাগত অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংকটের সৃষ্টি হয়, তার কোনো চূড়ান্ত মীমাংসা ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সম্ভব হয় না—যদিও ধনতন্ত্র সাময়িকভাবে এই সংকট উত্তীর্ণ হয়ে নিজের অস্তিত্বকে কিছুদিন টিকিয়ে রাখতে, এবং নিজের অনিবার্য ধ্বংসকে বিলম্বিত করতে পারে।

যে-রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটেছিল সেটি যে শুধু একটি পশ্চাৎপদ দেশ ছিল তাই নয়, বিপ্লবের পর নতুন রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘেরাও এবং আক্রান্ত হয়েছিল বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের দ্বারা। এই দুই পরিস্থিতি সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর আবির্ভাবকে কিভাবে পদে-পদে ব্যাহত করেছিল, ধনতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও প্রক্রিয়া কিভাবে সমাজতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত ক'রে সেখানে নতুনভাবে কিছু ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়মাবলীর প্রত্যাবর্তন ও সংশোধনবাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল, সেটি বুঝতে সক্ষম হলে সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে এবং চীনেও যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, এবং ঘটে চলেছে, সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা সহজ হবে, এবং সেই সঙ্গে বোঝা যাবে যে, কোনো বিশেষ দেশ বা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এককালীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাময়িক ব্যর্থতার অর্থ ঐতিহাসিক এক বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা অথবা তার সম্ভাবনার বিনাশ নয়।

কোনো পশ্চাৎপদ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পর সেখানে উৎপাদনের বিকাশ ঘটাতে গিয়ে উৎপাদনের যে সামাজিকীকরণ ঘটায়, সেটা যে ইতিপূর্বে ঐতিহাসিকভাবে ধনতন্ত্রই সম্পন্ন করেছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মালিকানার আকার খুব বড়ো হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের ক্ষেত্র হত ক্ষুদ্র। একজন জমিমালিকের লক্ষ একর জমি থাকলেও তার জমিতে যারা চাষাবাদ করত তারা ছোটো-ছোটো খণ্ড-খণ্ড জমিতে পৃথক-ভাবেই তা করত। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় বিভিন্ন শিল্পসামগ্রীও সেইভাবে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত উৎপাদকদের দ্বারা তৈরি হত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মালিকানার আকার ছোটো না হলেও উৎপাদনের এই পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে সেখানে যৌথ সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

সমাজতন্ত্রের নির্মাণ-কাজে কিছু ধনতান্ত্রিক উপাদান এসে পড়ে

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ-প্রক্রিয়া জারি করা হলেও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার সময়ে এমন কতকগুলি নিয়মের আবির্ভাব হয়, এবং সেইসব নিয়মের বশবর্তী হয়ে এমন কতকগুলি অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি পদক্ষেপ নিতে হয়, যার মধ্যে কিছু ধনতান্ত্রিক উপাদান অবশ্যম্ভাবিরূপে বিরাজমান থাকে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে, ঐতিহাসিকভাবে সমাজতন্ত্র এমন এক পর্যায়ের উৎপাদন-ও সমাজব্যবস্থা, যে পর্যায়ে উৎপাদনের সামাজিকীকরণের কাজটি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই এই "আদর্শ" ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অনুপস্থিতিতে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ শুরু করে তাকে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজের দিক পরিচালনা করতে গিয়ে যেসব নিয়মগত জটিলতা এবং একাধিক ব্যবস্থার নিয়মাবলীর সংমিশ্রণ ও পারস্পরিক প্রভাববিস্তার ঘটে, তার ফলে সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর স্বাভাবিক ও মসৃণ বিকাশ সম্ভব হয় না। তার মধ্যে অনেক ধনতান্ত্রিক বিকৃতিও অবশ্যম্ভাবিরূপে দেখা দেয়, যে বিকৃতির উপর কোনো ব্যক্তিবিশেষের হাত থাকে না, যা হয় সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির ইচ্ছা-নিরপেক্ষ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে কৃষি-উৎপাদনের সামাজিকীকরণপদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন হলেও এদিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। উভয় ক্ষেত্রেই, ভিন্নভাবে হলেও, ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণার কিছু প্রভাব এমনভাবে বিদ্যমান ছিল যা পরবর্তী কালে সংশোধনবাদ ও ধনতান্ত্রিক শক্তি জোরদার হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় খামার আর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদনের সামাজিকীকরণের জন্য যেসব পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল, সেগুলি রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের যথেষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিকাশের পর বিপ্লব সংঘটিত হলে নেওয়ার দরকার হত না। কারণ, তখন উৎপাদনের সামাজিকীকরণ আগেই হয়ে থাকত, এবং তার ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ অনেক বেশি সহজ হত এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়মাবলীও তুলনামূলকভাবে অনেক স্বাভাবিক অবস্থায় আবির্ভূত আর বিকশিত হতে পারত। চীনে কৃষি-উৎপাদনের সামাজিকীকরণ পারস্পরিক সাহায্য সমিতি, সমবায় সমিতি ও কমিউন-পদ্ধতির মাধ্যমে হলেও সেখানে এক পর্যায়ে উপস্থিত হয়ে, কৃষি-অর্থনীতির পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ধনতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং অনেকখানি সামাজিকীকরণ সত্ত্বেও তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, ব্যক্তিগত হিসেবনিকেশের ব্যাপারকে যেভাবে প্রশ্রয় দিতে হয়, তার ফলে সমাজতান্ত্রিক নিয়মকানুনের অধিকতর বিকাশ এবং উন্নততর আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত হয়। শুধু তাই নয়, সেই পর্যায় থেকে, সাময়িক-ভাবে হলেও, সেখানে এক উলটো যাত্রা শুরু হয়, যার প্রথম প্রবল বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে এবং পরবর্তী কালে মাওয়ের মৃত্যুর পর ধনতান্ত্রিক প্রভাব সেখানে খুব বড়ো ধরনের কোনো ওলটপালট ছাড়াই প্রাধান্যে আসে।

বিপ্লবের পর কিভাবে ধনতান্ত্রিক প্রভাব সমাজতান্ত্রিক নিয়ম তথা ব্যবস্থার আবির্ভাব ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, এবং একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ধনতান্ত্রিক জটিলতা আর বিকৃতির সৃষ্টি করে, আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায় অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে। এবং এসব ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি এই জটিলতা আর বিকৃতির জন্মদান করে, সেটা সৃষ্টি হয় বিপ্লবোত্তর একটি সমাজব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা এবং সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক তার উপর নানাভাবে আক্রমণ পরিচালনা করা এবং অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার ফলে।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পরবর্তী পরিস্থিতির দিকে তাকালে এ বিষয়টি কিছুটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। ধনতান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ এবং সেই সাথে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করা হলেও এইসব উৎপাদিত স্বার্থ বিপ্লবোত্তর পর্যায়েও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। এজন্য তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর বাইরের থেকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং ভিতর থেকে তার বিরুদ্ধে পরাজিত শত্রুদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা—দুই-ই অব্যাহত ছিল, এবং এই দুই ধরনের তৎপরতার মধ্যে আবার ছিল খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বাইরের আর ভিতরের এইসব শত্রুর আগ্রাসী এবং অন্তর্ঘাতমূলক

মাজকর্ম এবং তৎপরতার মোকাবেলা করার জন্য সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রকে এমন কতকগুলি কাজ করতে হয়েছিল যে কাজগুলি করা কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দরকার হয় না। যেমন, (ক) গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া, (খ) সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা, তার শক্তি নানা-ভাবে বৃদ্ধি করতে থাকা, আর সেই সাথে সামরিক খাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি করে চলা, (গ) আমলাতন্ত্রকে উত্তরোত্তর খর্ব করে আনা আর উচ্ছেদের দিকে নিয়ে যাবার পরিবর্তে তার শক্তি বজায় থাকা, এমনকী যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে সামরিক আর বেসামরিক আমলাতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হওয়া ইত্যাদি।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা অবস্থায় এবং সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ এজেনটদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মুখে সমাজতন্ত্রকে একটি দেশে টিকিয়ে রাখা এবং তার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে উল্লিখিত যেসব সংস্থা আর সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছে, এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব কাজ করতে হয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানগুলি মোটেই সমাজতান্ত্রিক সংস্থা-সংগঠন নয়, সমাজতন্ত্রের জন্য তাদের কোনো দরকার নেই, উপরন্তু সমাজ-তান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ এবং সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর উদ্ভব আর বিকাশের ক্ষেত্রে সেগুলি এক বিরাট প্রতিবন্ধক। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ধনতান্ত্রিক আর সংশোধনবাদী চেতনার বিকাশের বস্তুগত ভিত্তিভূমি হিসেবেই এইসব সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া কার্যকর থাকে।

একটি চুম্বককে কিছু লৌহকণার কাছাকাছি স্থাপন করলে লৌহকণাগুলির যেমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, লৌহকণাগুলি চুম্বকের অবস্থান অনুযায়ী এক-একভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, ঠিক তেমনি মানবসমাজে এক-একটি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গঠিত হলে তাকে কেন্দ্র করেও মানুষের অভ্যাস-আচরণ, চিন্তাচেতনা এবং কাজকর্মের এক-একটি বিশেষ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মানুষ কতকগুলি বিশেষ ও নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন হয়, অথবা সেইসব নিয়মের অধীন হওয়ার প্রবণতা সেখানে সৃষ্টি হয়। ঠিক একারণেই গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, সামরিক বাহিনী এবং সামরিক ব্যয়—এ সবকিছুই শত্রুর আক্রমণের থেকে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলেও এই প্রয়োজনীয় সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার নিয়মাবলী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে এমনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যাতে সেই পরিস্থিতিতে সেখানে সমাজতন্ত্রের নিজস্ব নিয়মাবলীর উদ্ভব, এবং বিশেষ করে বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে থাকে।

এক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে লক্ষ রাখা দরকার তা হল, সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকা অবস্থায় একটি পশ্চাৎপদ দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ স্বাধীনভাবে সম্ভব হয় না এবং স্বাধীনভাবে সেটা সম্ভব না হওয়ার কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার আর ধ্যানধারণার প্রভাব। ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, নিয়মাবলীর পারস্পরিক প্রভাব এমন এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বিদ্যমান থাকে যখন অনেক বাহ্যিক জৌলুস সত্ত্বেও ধনতন্ত্র আর সাম্রাজ্য-বাদের অবক্ষয় হতে থাকে, তারা ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়। সামন্তবাদ আর ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়াই মোটামুটিভাবে জারি থাকতে দেখা গেছে, এবং সামন্তবাদকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ধনতন্ত্রের আর তার নিয়মাবলীর পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ ঘটতে সময় লেগেছে। শুধু তাই নয়। এই পর্যায়ে ক্ষয়িষ্ণুতা ও ধ্বংসোন্মুখতা সত্ত্বেও, সাময়িকভাবে হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই সামন্তবাদী ধ্যানধারণা আর শক্তি ধনতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয় অর্জন করেছে। ব্রিটেন আর ফ্রান্সে এই ধরনের টানাপোড়েনের ব্যাপার এ দুই দেশে

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের এবং উপরিকাঠামো গঠনের ইতিহাসে অনেক দেখা গেছে। এসব ঘটনা উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, এ দুই দেশেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্ভব আর বিকাশ ধনতন্ত্রের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে ঘটেছে।

লেনিন-স্তালিন আমলের রুশদেশে কতকগুলি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা

লেনিন এবং বিশেষ করে স্তালিনের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে তাই অনেক কিছুই করার প্রয়োজন অনিবার্য হয়েছিল যেসব কাজ নিরুপদ্রব সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে করার প্রয়োজন একেবারেই হয় না। উদাহরণস্বরূপ, স্তালিনের আমলে যৌথখামারপ্রথা প্রচলনের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপ্লবপূর্ব পর্যায়ে রাশিয়ায় ধনতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক বিকাশের মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদন-ক্ষেত্রে যদি সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হয়ে থাকত, তাহলে স্তালিনকে তৎকালীন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে যৌথ-খামারপ্রথা চালু করতে গিয়ে যেভাবে কিছুটা বল-প্রয়োগের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, বিশেষত কুলাকদের ক্ষেত্রে, সেটার কোনো প্রয়োজন হত না। কিন্তু বাস্তবত তখন তার প্রয়োজন হয়েছিল, এবং সেভাবে যদি পরিস্থিতির মোকাবেলা করা না হত তাহলে কৃষি, শিল্প, বণ্টনব্যবস্থা ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা যেত না এবং খুব দ্রুতগতিতে প্রতিবিপ্লব সেখানে বিপ্লবকে পরাভূত করত। এক্ষেত্রে যারা স্তালিনের সমালোচনা করে থাকে, যারা তাঁকে, তাঁর নেতৃত্বাধীন পার্টিকে বলপ্রয়োগ, নির্মমতা ইত্যাদির অভিযোগে অভিযুক্ত করে থাকে, তারা হয় তৎকালীন পরিস্থিতির সব দিক বিবেচনা করে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজের ক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারত তা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়, অথবা ট্রটস্কিপন্থী এবং বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী এজেনটদের পরিচিত স্তালিন-ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই সে কাজ করে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত ও ঘেরাও হয়ে থাকা, তাদের এজেনট এবং স্থানীয় সামন্ত-ধনতান্ত্রিক স্বার্থসমূহের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মোকাবেলা করে চলা, এবং প্রয়োজনীয় কোনো ধরনের পণ্য-সামগ্রীর আমদানি অসম্ভব থাকায় সব কিছু আভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদন করা এবং যৌথভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সুষমভাবে বণ্টন করার দায়িত্ব তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে যাঁদের উপর ছিল তাঁরা এমন এক গুরুদায়িত্ব বহন করতেন যে দায়িত্বের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি বুর্জোয়া চিন্তায় অভ্যস্ত ব্যক্তি অথবা বৈঠকখানার কেদারায় উপবিষ্ট বিপ্লবী অথবা ট্রটস্কি ও ট্রটস্কিপন্থীদের মতো অন্ধ স্তালিন-বিরোধীদের কাজকর্ম ও রচনার মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়, এবং সেটা পাওয়াও যায় না। তৎকালীন পরিস্থিতিতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং স্তালিনকে যেসব কাজ করতে হয়েছিল, ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও (যা দুই কারণে ছিল স্বাভাবিক। প্রথমত, ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা সব সময়েই সম্ভব; দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা সেই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কারো ছিল না) একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, লেনিনএবং বিশেষত স্তালিনের আমলে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ সম্পন্ন করতে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত পার্টি আর রাষ্ট্রকে যেসব পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল সেগুলি অনিবার্য ছিল, সেগুলি নেয়া ব্যতীত অন্য কিছু করা তৎকালীন পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিল না।

স্তালিন-অনুসৃত সব নীতিই ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুবর্তী

শুধু তাই নয়। এখানে আর-একটি কথা খুব স্পষ্ট-

ভাবেই বলা দরকার। "স্তালিনবাদ"-এর কথা উঠলে স্তালিন নিজে সব সময়েই তাঁর নিজের অবস্থানকে এইভাবে আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে আপত্তি করতেন এবং বলতেন যে, "স্তালিনবাদ" বলে পৃথক আর স্বতন্ত্র কিছু নেই, তিনি নিজে লেনিনের একজন শিষ্য মাত্র এবং তিনি যা কিছু করেছেন সেটা তিনি করেছেন লেনিনের শিষ্য হিসেবেই। একথা সঠিক। কারণ, বস্তুতপক্ষে পরিস্থিতির নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে স্তালিনকে যেসব কর্তব্য নির্ধারণ করতে হয়েছিল, যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হয়েছিল, সেগুলি সবই ছিল লেনিনবাদের অনুবর্তী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ট্রটস্কি এবং ট্রটস্কিবাদীরা, আর সেই সাথে বিভিন্ন বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী মহল স্তালিনের দ্বারা অনুসৃত নীতি আর কর্মসূচীসমূহকে লেনিনের চিন্তাধারা থেকে পৃথক করে দেখাবার চেষ্টায়, তাঁকে লেনিনবাদের বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত ও আখ্যায়িত করে এসেছে, এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই করে চলেছে। সেই হিসেবে আজকের দিনে "স্তালিনবাদ" সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু না বললে বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেসব সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী নির্ধারিত, অনুসৃত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল, এবং সাম্রাজ্যবাদের ও সাম্রাজ্যবাদের সহায়তাপ্রাপ্ত রুশ প্রতিবিপ্লবীদের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মোকাবেলা করতে গিয়ে যেসব নীতি, সংস্থা, সংগঠন ইত্যাদি অপরিহার্যভাবে গ্রহণ ও গঠন করতে হয়েছিল, এবং তার পরিণতিতে কিভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাব বিস্তার লাভের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বোঝা যাবে না।

স্তালিনবাদ হল এমন এক ঐতিহাসিক সময়ের মার্কসবাদ আর সমাজতন্ত্র, যে পর্যায়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে বিপ্লবের পরিবর্তে পশ্চাৎপদ দেশসমূহের শ্রমিক-কৃষকের যৌথ বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্তবুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতাথেকে উৎখাত হয়, যে পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ আর তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেনটদের বহিরাক্রমণ ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মোকাবেলা করে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজ সম্পন্ন করে যেতে হয়। স্তালিন লেনিনবাদকে সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। সেটা সঠিক ছিল। এবং সেই আখ্যা অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে এবং সেই পরিস্থিতিতে লেনিন আর স্তালিনের অনুসৃত নীতির পর্যালোচনা আর মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, উপরে "স্তালিনবাদে"র সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে যা বলা হয়েছে, সেটা লেনিনবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এজন্য প্রকৃত অর্থেই লেনিনবাদ ও স্তালিনবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। স্তালিনবাদ হল সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনপরবর্তী যুগে লেনিনীয় নীতিরই অনুশীলন আর পরিবর্ধন মাত্র।

বিপ্লবের অল্পকাল পরই ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে লেনিনের মৃত্যু ঘটার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজের মূল দায়িত্ব স্তালিনের উপরই বর্তায় এবং স্তালিন সেই দায়িত্ব অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেন। একটি পশ্চাৎপদ দেশ থেকে সমগ্র রাশিয়া তাঁর নেতৃত্বে পরিণত হয় একটি শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্ক ও স্বার্থ উচ্ছেদ করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক, সকলের জন্য হয় কর্মসংস্থান, রুটনব্যবস্থা সুষম করে সেখানে জনগণের জন্য হয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত। বিশ্বের দেশে-দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে বৈপ্লবিক প্রেরণা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তার সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ক'রে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে। এরপর এক ভয়ানক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের মোকাবেলা ক'রে, তাকে পরাজিত করে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে অপরাপর ইউরোপীয় দেশের মতো মার্কিনের থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ছাড়াই

নিজেদের সম্পদের উপর নির্ভরশীল থেকে পুনর্গঠন-কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ১৯৫৩ সালের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত ক'রে স্তালিনের নেতৃত্বাধীন পার্টি ও রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণসিদ্ধ করে। এইসব "অপরাধমূলক" কাজের জন্যই সমগ্র বুর্জোয়া মহলে স্তালিনের ক্ষমা নেই। তারা ক্ষেত্রবিশেষে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, এমনকী পরবর্তীকালে মাও সম্পর্কে দু-চারটি প্রশংসাসূচক কথা বললেও (যদিও এখন তারা লেনিন আর মাও-এর বিরুদ্ধে নোতুন উদ্যমে তাদের সমালোচনা আবার শুরু করেছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমনকী খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নেও লেনিনের মূর্তি পর্যন্ত অপসারণ করছে, ভেঙে ফেলছে) স্তালিন সম্পর্কে তাদের কণামাত্র ইতিবাচক মূল্যায়ন নেই।

সকল ধরনের শ্রমজীবীর, কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শোষিত নির্যাতিত জনগণের শত্রু বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও বিভিন্ন দেশীয় শোষক-শাসক শ্রেণীর লোকেরা ও তাদের নেমক-খাওয়া, পা-চাটা বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে স্তালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে, যেভাবে তাঁর বিরুদ্ধে তাদের বিষোদ্গার বিরামহীনভাবে অব্যাহত রাখে, সেটাই হল স্তালিনের বৈপ্লবিক চরিত্র, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আর আনুগত্য এবং সকল ধরনের ধনতন্ত্র-ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কারণ, স্তালিনের এইসব গণ-বিরোধী সমালোচকরা জনগণের স্বার্থে, মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্তালিনের সমালোচনা করে না। উপরন্তু, বিশ্বের দেশে-দেশে এবং নিজেদের দেশেও বিপ্লবের বিরোধিতায় নির্যাতন আর বল-প্রয়োগের যে-কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে তারা কখনো পরাঙ্মুখ হয় না। কাজেই তারা এ সমালোচনা করে এজন্য যে, স্তালিনবাদের মধ্যেই তাদের ধ্বংসের বীজ নিহিত, স্তালিনবাদ ব্যতীত তাদেরকে উৎখাত করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

একটি পশ্চাৎপদ দেশে বিপ্লব হলে এবং সেখানে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাজের সাথে সমান্তরালভাবে কিছু বুর্জোয়া উপাদানের উপস্থিতিও অনিবার্যভাবে থাকলে, দুইয়ের টানাপোড়েনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সংশোধনবাদ যে মাথা চাড়া দিতে পারে, একথা লেনিন, স্তালিন, মাও—সকলেই বলে এসেছেন। লেনিন এ বিষয়ে তাত্ত্বিকভাবে যথেষ্ট আলোচনা বিপ্লবোত্তর পর্যায়ে তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে করে গেছেন, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কেও ঠিক এ কারণেই সতর্ক করে গেছেন। কাজেই সোভিয়েত ইউনিয়নে, পূর্ব-ইউরোপের এককালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর চীনে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে সেটা মার্কসবাদীদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কোনো ব্যাপার নয়। উপরন্তু এইসব পরিবর্তন এবং ইতিহাসের এই পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের ব্যাখ্যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদই এতদিন বিজ্ঞান-সম্মতভাবে প্রদান করে এসেছে এবং এখনো সেই-ভাবেই সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পরিবর্তনকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ, এই ব্যাখ্যা সঠিকভাবে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদসম্মতভাবে উপস্থিত করতে না পারলে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব-ইউরোপ, চীন ইত্যাদি দেশে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে আর ঘটে চলেছে, তাকে সমাজতন্ত্রের পতন ও ধ্বংস হিসেবে সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে প্রচার করছে সেই প্রচারই জনগণের মধ্যে প্রাধান্যে থাকবে এবং তার ফলে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবোত্তর কালে এবং তার পর থেকে একের পর এক পশ্চাৎপদ দেশে যেখানেই বিপ্লব সংঘটিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে, সেখানে "স্তালিনবাদ" ব্যতীত অন্য কোনো পথে সেটা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। শুধু তাই নয়,

যে পর্যন্ত ওইসব দেশে "স্তালিনবাদ" অনুসৃত হয়েছে ঠিক সে পর্যন্তই সেখানে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে, সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তারা একের পর এক বিজয় অর্জন করেছে, সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। যেখানে তারা স্তালিনবাদ থেকে সরে গেছে, স্তালিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে সংশোধনবাদের পথে গেছে, সেখানেই ধীরে-ধীরে সংশোধনবাদ আর সরাসরি ধনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে, ঠিক যেমনটি ঘটেছে ১৯৫৩ সালের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ-ব্রেঝনেভ-গোর্বাচেভের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং আলবেনিয়া ব্যতীত পূর্ব ইউরোপের অপরাপর দেশে।

১৯৮৯-৯০ সালে পূর্ব ইউরোপে যে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক নামে পরিচিত দেশগুলিতে যেভাবে ধনতন্ত্রের সরাসরি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেটা রাতারাতি হঠাৎ করে ঘটে নি। অনেক আগে থেকেই সেখানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং স্তালিনবাদ বর্জন ক'রে সংশোধনবাদ আর সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের প্রভাব কার্যকর থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ উশকানি আর সহযোগিতায় প্রাধান্যে এসে সমাজতন্ত্রের বাহ্যিক কাঠামো পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

এক্ষেত্রে একটিমাত্র দেশ এ পর্যন্ত ব্যতিক্রম হিসেবে টিকে আছে। আলবেনিয়ার পক্ষে এভাবে টিকে থাকার একমাত্র কারণ আনোয়ার হোজার নেতৃত্বে তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, স্তালিনবাদকে বর্জন করে নি, উপরন্তু তারই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য আজও অব্যাহত রেখেছে। কাজেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, স্তালিনবাদী হিসেবে পরিচিত আলবেনিয়াই এখন একমাত্র দেশ যেখানে সমাজতন্ত্র হাজারো অসুবিধা, ঝুঁকি আর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও একটি ব্যবস্থা হিসেবে শক্তিশালী ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। স্তালিনের জীবদ্দশায় সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিনবাদের সমাজতান্ত্রিক শক্তি যেমন প্রমাণিত হয়েছিল বিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের নানা সমস্যা ও সংকটের মুখে, ঠিক তেমনি আনোয়ার হোজার নেতৃত্বে আলবানিয়াও স্তালিনবাদের সমাজতান্ত্রিক শক্তি চল্লিশ থেকে আশির দশকের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে নোতুনভাবে প্রমাণিত করেছে। আনোয়ার হোজার সহযোদ্ধা, স্তালিনবাদী রামিজ আলেয়ার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আলবেনিয়ায় এখানে পর্যন্ত যা ঘটে নি সেটা প্রকৃত সমাজতন্ত্রীদের কাছে পূর্ব-ইউরোপের অপরাপর দেশে যা ঘটেছে তার থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সোভিয়েত-মার্কিন যৌথ উদ্যোগে পূর্ব-ইউরোপে এককালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে ভেঙে যেভাবে চুরমার করা সম্ভব হয়েছে, সেটা আলবেনিয়ায় মোটেই সম্ভব হয় নি।

সাম্রাজ্যবাদীরা আলবেনিয়ার মতো একটি ছোটো দেশ আর ক্ষুদ্র শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সব ধরনের তৎপরতা বজায় রেখেছে। এ ব্যাপারে সোভিয়েত-মার্কিন যৌথ চক্রান্ত সব সময়েই অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যেই আলবেনিয়া এখনো পর্যন্ত তার গৌরব সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

একটি কথা অবশ্য এক্ষেত্রে বলা দরকার। আলবেনিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে এখনো পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হলেও ভবিষ্যতে যদি অন্যান্য দেশের মতো সেখানেও সংশোধনবাদী আর সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বৃদ্ধি পায়, এমনকী সেখানকার অবস্থা পূর্ব-ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো দাঁড়ায়, তাহলেও তার দ্বারা এটা বিন্দুমাত্র প্রমাণিত হবে না যে, এইসব বিপর্যয়ের আর পশ্চাদপসরণের কারণে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বলতে আর কিছু নেই, অর্থাৎ একটি ঐতিহাসিক বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের কোনো সম্ভাবনা আর নেই।

মোটেই তা নয়। আমরা স্তালিনের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়ন আর আলবেনিয়ার উল্লেখ

এক্ষেত্রে করেছি সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে। চীন এবং অপরাপর দেশের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। কিন্তু এসব দেশে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিপর্যয় ঘটলে সে বিপর্যয়কে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হিসেবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া এক বিষম মারাত্মক ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

একটি অথবা একাধিক সমাজতান্ত্রিক দেশ যতদিন শক্তিশালী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকে, ততদিন সেদেশগুলির অভ্যন্তরে ধনতান্ত্রিক শক্তিসমূহ যে সক্রিয় থাকে, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে একটি শ্রেণী যতই শোষিত নির্যাতিত হোক, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যথেষ্ট ভোগ-বিলাস এবং উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে জীবনযাপন করে। তাদের এই জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রচার সমাজতান্ত্রিক দেশের অভ্যন্তরে ধনতান্ত্রিক-প্রবণতাসম্পন্ন লোকদের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সচেতন ও সক্রিয় ভাবে এই প্রভাবের মোকাবেলা করা না হলে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর শেষ পর্যন্ত প্রাধান্যে আসে। কাজেই যতদিন না সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পতন হচ্ছে অথবা বিশ্বব্যাপী তারা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ছে, ততদিন কোনো দেশেই সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর সুষ্ঠু ও মসৃণ বিকাশ সম্ভব নয়।

১৯৮৯ সালের ঘটনাবলী লক্ষ করে অনেকের মনে হতে পারে যে, সারা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বিজয় অর্জনের কোনো সম্ভাবনা আর নেই। কিন্তু সমাজবিকাশের ধারা, তার নিয়মাবলীর দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে, এর থেকে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। ১৯৮৯ সালে ইউরোপে যা ঘটেছে, তার ফলে সারা বিশ্বে শ্রেণীসংগ্রাম কি থেমে গেছে? ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সামাজিক-উৎপাদনের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বিরাজমান, সে দ্বন্দ্বের কোনো সমাধানের ইঙ্গিত কি ১৯৮৯ সালের ঘটনাবলীর মধ্যে আছে? সমাজতন্ত্র বাতিল করে দিলে তার পরিবর্তে অন্য কোনো বিশ্বব্যবস্থার বাস্তব আবির্ভাব, এমনকী তাত্ত্বিক সূত্রায়ণ কি হয়েছে? না, এসব কিছুই হয় নি এবং হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, ১৯৮৯ সালের ঘটনাবলী সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রই হচ্ছে ধনতন্ত্রের পরবর্তী ঐতিহাসিক বিশ্বব্যবস্থা। একমাত্র এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত মৌলিক দ্বন্দ্ব এবং তার থেকে সৃষ্ট হাজারো দ্বন্দ্বের মীমাংসা আর সমাধান সম্ভব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমাজবিকাশের এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার, সমাজবিকাশের এই নিয়মাবলীরই সূত্রায়ণ।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে একদিকে যেমন দেশে-দেশে শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে, যে সংগ্রাম ধনতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদকে ক্রমাগত আঘাত করে চলেছে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের সংকট প্রতিদিনই বিশ্বকে নোতুন-নোতুন বিপদ আর ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। মধ্য-প্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতন্ত্রের বিশ্বসংকটেরই সর্বশেষ উদাহরণ। এই ঘটনাবলী সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার পরিবর্তে এটাই নোতুনভাবে ও নোতুন পরিস্থিতিতে প্রমাণ করেছে যে, একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে মানব-সমাজে ধনতন্ত্র কোনো গ্রাহ্য ব্যবস্থা নয়।

সারা বিশ্বের অনুন্নত, পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ আর তার অনুগত শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। আমাদের দেশও সেদিক থেকে কোনো ব্যতিক্রম নয়। এই সংগ্রাম চলতে বাধ্য, কারণ আমরা সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত, তার নির্মম শাসন আমাদের উপর

প্রতিষ্ঠিত। এ শোষণ এবং শাসন অবসানের জন্য যে সংগ্রাম করতে হয় তা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, এই সংগ্রামের অবসানে যে সমাজব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয় তা হল সমাজতন্ত্র। কাজেই, পূর্ব-ইউরোপে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বা চীনে যা ঘটছে তার থেকে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আমাদের থাকলেও তার থেকে একথা মনে করার কোনো কারণ আমাদের নেই যে, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যতের কথা বলা এক অর্থহীন বাগাড়ম্বর। মোটেই তা নয়। উপরন্তু, আমাদের কাছে সমাজতন্ত্র একটি অতি আবশ্যিক ব্যবস্থা যা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়াই বর্তমান পর্যায়ে আমাদের সবথেকে জরুরি কর্তব্য।

কিন্তু শুধু বিশ্বের পশ্চাৎপদ দেশগুলিতেই নয়, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ১৯৮৯ সালের ঘটনাবলীর পরও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম চলছে, এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে জোরদার হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপের যে দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক "স্বর্গের" চিত্র "নতুন বিপ্লব" সৃষ্টি করেছে সেগুলিতেও এখন ব্যাপক আকারে শ্রমিকধর্মঘট চলছে এবং সেইসব ধর্মঘট নব্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে আঘাত করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আগ্রাসন বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধি করলেও তার মধ্যে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির কোনো পরিচয় নেই। উপরন্তু তাদের অন্তর্নিহিত সংকটই তাদেরকে নতুনভাবে আগ্রাসনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একারণে তাদের এই আগ্রাসন বেশিদিন অব্যাহত রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসংকটের কারণে ও সমাজবিকাশের নিয়ম অনুযায়ী সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্র পিছু হটতে বাধ্য। সেই পরিস্থিতিতে বিশ্বের দেশে-দেশে নতুনভাবে বিপ্লবের জোয়ার দেখা দেবে, যেভাবে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে মুক্তি লাভ ক'রে একের পর এক দেশ তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

সারা বিশ্বে এই পরিবর্তনের ধারা প্রবর্তিত হলে সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল সে পরিস্থিতির অবসান ঘটবে। তখন এক-একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে খুব স্বাভাবিক, সুষ্ঠু এবং অপেক্ষাকৃত মসৃণভাবে সমাজতান্ত্রিক নিয়মাবলীর আবির্ভাব আর প্রতিষ্ঠা অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, প্রশাসন, দেশরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্ভব হবে। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অতীতের থেকে হাজার গুণে নিরাপদ ও হুমকিবিহীন হবে। কারণ তখন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা সমাজতন্ত্রের ঘেরাও হওয়ার পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দ্বারা সাম্রাজ্যবাদই ঘেরাও হবে এবং ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

কাজেই, ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলীর পরে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেসব প্রশ্নের আর সন্দেহের উদ্ভব হয়েছে তার জবাবে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই একথা ঠিক নয়, কারণ সমাজতন্ত্রই হল মানবসমাজের ভবিষ্যৎ।

নীলজল

সুনীলকুমার নন্দী

এখন কোথায় তাকে নিয়ে যাবে
নিয়ে যেতে চাও কোন্ ছায়াময় বুকের সবুজে ?
কত-যে কলুষ রক্ত ইতিমধ্যে হৃৎপিণ্ডে ঢেলে
চারিয়ে দিয়েছ বিষ
প্রতিটি ধমনী বেয়ে সমস্ত শরীরে।

আর একটু এগিয়ে এসে ঘন হও, ঘন হয়ে দেখো, দেখবে
আজ তার নিঃশ্বাসেও দাহ, যেন
চোখে
চিতার আগুন জ্বলছে
ঝলকে-ঝলকে।

আপাতত, তাকে দেখে মনে হয়, মনে হতে পারে
তেমন-কিছু না, হয়তো আছে, বেশ আছে ;
অথচ গভীরে সে তো
জ্বলতে-জ্বলতে ভস্ম হয়, ভস্ম হয়ে
শোষে
শিকড়ে জড়ানো যত যৌথ প্রতিশ্রুতি, নীলজল—
যা কিনা শুকিয়ে এলে শূন্যের হাঁ-মুখ
ধু-ধু।

নীলজলে মিশে আছে
শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত ছায়াময় বুকের সবুজ।

জন্মসূত্র

সমর চক্রবর্তী

হারাবার থাকে না তেমন যদি দৃঢ় হয় শেকড় পত্তন
বৃক্ষ কি তামাশা হল বনস্থলে আজ? নইলে এমন
পাতা ঝরে যায় কেন! মৃত্যুভয় তীক্ষ্ণতম উঁকি দেয় চিত্রপটে,
জন্ম কেন? প্রয়োজনে না বিলাসে? আজো আমরা সে কথা
বুঝতে পারি নি তাই যোগসাধনায় অবিশ্বাসী হয়ে
হঠকারিতায় হাত পা পোড়াতে পারি, ব্যর্থতার
প্রবাহে কাতর তবু অহংকার ধরে রাখি চূড়ান্তে প্রবল,
আমাদের সন্ততির বিশ্রামবাসনা নেই, থাকবে না জানি
অথচ বৃক্ষের কাছে শুধু ধৈর্যটুকু শিখে নিলে ঢের হত।

বৃক্ষ কোনো দেবতার কথা নয়, অথবা জীবন, সে তোমার
হতাশা দূষণ শব্দে কারুকাজ দিতে পারে, জন্ম কেন
এই সত্য, স্বার্থহীন ভালোবাসা আর সহনশীলতা
প্রভূত আয়ত্তে এলে আর কিছু হারাবার ভয় থাকে না কখনো।

আবহমান

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

জীবনের ঘ্রাণিমায় হৃদয়ের দুরন্ত এত?
বুঝি নি তা আগে—

না, না, তার চেয়ে বেশ আছি এই অন্ধকারে
এই-ই ভালো।

ভয় হয়! যদি এই অন্ধকার মুছে যায়?
প্রকাশ্যে নামে আদিকবি চাঁদ! অদ্বিতীয়!

কী দেখব তখন? কেউ নেই চারপাশে?
আমাকে একলা রেখে সকলেই সরে গ্যাছে
ওই হৃদয় আর জীবন যেমন?

আমি এমনিই দেখেছি তো পড়ন্তবেলা
কী একটা অচেনা পাখির প্রাণান্ত পণে
দুটি তারা জ্বেলে দিয়েছে যে
সন্ধ্যার অনেক আগেই—

এখনো তো তিনপ্রহর বাকি! তাহলে?
যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীবনের কাছে
হৃদয়ের আবেদন কত ব্যর্থ, নিষ্ফল, বিপন্ন
তনু-অবয়ব, পীড়িত আলিঙ্গন!

তার চেয়ে এই অন্ধকার ভালো—তবু তার
অন্তরীক্ষে ঢাকা থাক গূঢ় ক্ষত, শেষ সমর্পণ।

বাঁচো, বেঁচে থাকো

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়

নিটোল একটা অসুখের দৃশ্য
গ্যাসবেলুনের মতো ভেসে যাচ্ছে, আর পাশবালিশটি
ঘুমের ভিতরে খুব ঠাণ্ডা মাথায়
খুন করছে আমাকে

হাতের মুঠোয় নরম মাটির মতো
ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে আমার হৃদয়
দুহাত তুলে আমি আত্মসমর্পণ করেছি—
তরল আঁধারে ভরা দুঃস্বপ্নে
যে-কোনো ট্রাংকুলাইজারের মতো রমণী এসেছে
'বাঁচো, বেঁচে থাকো আরো কিছুদিন
মাত্র একটাকার বিনিময়ে'

সুনীতিকুমারের ভারত-চেতনা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

প্রস্তাবনা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬ সালে এক পত্রে লেখেন, 'যথাসাধ্য কার্য করিয়া যাইতে চাই। এই কাজের মধ্যেই আনন্দ, ইহার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা, এই কাজের দ্বারাই আমরা in tune with Infinity থাকিতে পারিব।'[১] মধ্য বয়সে লেখা এই বাক্য দুটিতে সুনীতিকুমারের অন্তরঙ্গ জীবনসত্য অমোঘ রূপে প্রকাশিত। অবশ্য সত্য কথাটার তাৎপর্য নিয়ে সুনীতিকুমারের ঘোর সংশয় ছিল। ১৯৬৬ সালে তিনি এক পত্রে লেখেন, 'সত্য-দর্শন কার হয়েছে! যাঁদের হয়েছে অথবা যাঁরা মনে করেন তাঁদের সত্যদর্শন হয়েছে, তাঁদের আমি প্রণাম করি।'[২] এখানে তথাকথিত সত্যদ্রষ্টাদের ভ্রান্ত-মোহের প্রতি সুনীতিকুমারের মনোভাব স্পষ্ট। প্রশ্ন উঠতে পারে যে "সত্য" আর "মতে"র মধ্যে প্রভেদ কতটা বা কতটুকু। ১৯৭৬ সালে আর-এক পত্রে তিনি লেখেন, 'কোনও মতবাদে পঁহুছিবার দুই প্রকার পথ আছে—(১) বিশ্বাস (অনেক সময় অন্ধ বিশ্বাস), ও (২) যুক্তি ও বিচারের পথ। বিচারের পথই ভারতীয় চিন্তানেতাদের কাম্য। আমি সেই পথের পথিক।'[৩] উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে সুনীতিকুমারের ব্যক্তিত্বের একটি পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সেই পরিচয় এই যে তাঁর জীবনের আসল কাজ ছিল অনন্ত বা মহৎ কোনো উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যুক্তি আর বিচারের পথ ধরে চলা, চলতে-চলতে কোনো-কোনো মতবাদে পৌঁছনো অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু সত্যদর্শন খুব অল্প ভাগ্যবানদেরই হয়। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথপ্রসঙ্গে সুনীতিকুমার স্বীকার করেছেন যে যাঁরা সত্যের স্বরূপ জেনেছেন, শুধু তাঁরাই পেয়েছেন 'শান্তির অক্ষয় অধিকার।'[৪]

কিন্তু রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে সুনীতিকুমারের উপলব্ধি বর্তমান আলোচনার বিষয় নয়, যদিও সে বিষয়টি মধ্যে-মধ্যে আপন অধিকারে এই আলোচনার মধ্যে

প্রবেশ করবে। ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবেই সুনীতিকুমারের প্রথম পরিচয়, কিন্তু ক্রমে-ক্রমে তিনি এই পরিচয়ের সীমানা অতিক্রম করে তাঁর কাজের জগৎকে এক বিশ্বস্কর উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বহুব্যাপ্ত করেন। 'বিশ্বব্যাপারে' সুনীতিকুমারের 'সজীব আগ্রহে'র পরিচয় পেয়ে "জাভাষাত্রীর পত্রে" রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংস বিস্ময় লিপিবদ্ধ করেছেন। সুনীতিকুমারের সমগ্র রচনাবলীর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করলেই এটা বোঝা যাবে যে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহকে অতিক্রম করে গেছে তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা, তাঁর নৃতাত্ত্বিক জাতিজিজ্ঞাসা, তাঁর ভারতজিজ্ঞাসা এবং ভারতীয় মানুষের চরিত্রজিজ্ঞাসা, ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের ঐতিহাসিক সম্পর্ক অথবা বিশ্বসাহিত্যে বিধৃত বিশ্ব-মন সম্বন্ধে কৌতূহল।

সুনীতিকুমারের সমগ্র কর্মকাণ্ডের পরিমাপ করা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। তিনি যেন এক বিপুল গভীর বিচিত্র মহাদেশ এবং সেই মহাদেশের মানচিত্র অঙ্কনের জন্যে বিরাট আয়োজন চাই। এই ছোটো প্রবন্ধে আমরা শুধু তাঁর একটি দিক নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি। যুক্তি আর বিচারের পথ ধরে সত্যের অন্বেষণ একটা বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া। সুনীতিকুমার লিখেছেন, 'বিচারের পথই ভারতীয় চিন্তানেতাদের কাম্য।' তাহলে কি বিশ্বাসের পথ ভারতীয় চিন্তানেতাদের কাম্য নয়? পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যখন কোনো মতবাদের উদ্ভব এবং প্রসার হয়েছে, তখন সেই মতাবলম্বীরা সমগ্র অঞ্চলবাসীর সেই বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস দাবি করেছে, যারা সে-দাবি পুরণে রাজি হয় নি, তাদের প্রতি অনেক সময় নির্যাতন করেছে। মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ইউরোপীয়কে একই মতবাদে বিশ্বাসী করে তোলার ইতিহাস। সেখানে ভিন্ন মতে বিশ্বাসীদের খুঁজে-খুঁজে বার করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের তুলনা করলেই বিশ্বাসের পথ এবং যুক্তি আর বিচারের পথের পার্থক্যটা স্পষ্ট হবে। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরিবেশ, সামাজিক উত্তরাধিকার এবং জাতিগত সমন্বয়ের সাধনা নিশ্চয়ই ভারতীয় চিন্তানেতাদের যুক্তি আর বিচারের পথে চলতেই উৎসাহ জুগিয়েছে। কিন্তু যুক্তি আর বিচারের পথ ধরেচ ললে নতুন-নতুন তথ্য আর তত্ত্বের প্রভাবে সত্যের স্বরূপও বারবার রূপান্তরিত হবে। যুক্তি ও বিচারের পথে সত্যসন্ধানী সুনীতিকুমারের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চেতনা আর ধারণা জীবনের পর্বে-পর্বে কিভাবে নতুন-নতুন রূপ লাভ করেছে সেটাই বর্তমান আলোচনার মুখ্য বিষয়।

হিন্দু-ভারত

১৯২১ সালে লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বাঙলা ভাষার উদ্ভব আর বিকাশের বিষয়ে গবেষণা করে ডি. লিট. উপাধি নিয়ে সুনীতিকুমার প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আসেন স্লাভ ইনদো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন খোটানি-ভাষা এবং প্রাচীন গ্রীস এবং ইতালির শিল্প-সংস্কৃতি আর ইতিহাস অধ্যয়ন করতে। ১৯২২ সালের শেষের দিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম খয়রা অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ *The Study of Kol* ১৯২৩ সালে "কালকাটা রিভিয়ু" পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। পরের বছর ওই প্রবন্ধ থেকে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক অংশ বর্জন করে ঈষৎ পরিমার্জনা করে *Our Elder Brothers, the Kol People* নামে "বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি" পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। ওই ১৯২৪ সালেই "মডার্ন রিভিয়ু" পত্রিকাতে *Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilization* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন; পরের বছর ওই প্রবন্ধের সংযোজনরূপে একটি ছোটো প্রবন্ধ লেখেন *Recent Discoveries in Sind and the Punjab* নামে—এটি প্রকাশিত হয় "ইনডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি"তে। এখানে একটু থেমে দেখা যেতে পারে যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি যে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন সেই তিনটি প্রবন্ধেরই বক্তব্য একই—ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল ভিত্তি রচনা করেছে সেই প্রাক-আর্য জনগোষ্ঠী যাদের স্বাভাবিক স্থান ছিল বেদ-অনুসারী আর্য তথা সনাতন হিন্দু-সমাজের বাইরে।

এই সময় গান্ধীজী আইন অমান্য আর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর ভারতের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতা এক বিধ্বংসী শক্তি হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করে। সাইমন কমিশনের হিসেব অনুসারে ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে প্রায় ১১২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় এবং সরকারি হিসাবে তাতে অন্তত ৪৫০ জন নিহত হয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক দাঙ্গা ছিল ১৯২৬ সালে কলকাতার দাঙ্গা। হিন্দুরা তখন "শুদ্ধি" ও "সংগঠন" আন্দোলন এবং মুসলমানরা "তনজিম" ও "তবলিঘ" আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয় জনসমাজে বিদ্বেষ আর সন্দেহ এক নতুন বৈশিষ্ট্য হিসেবে শিকড় বিস্তার করতে থাকে। সেই দ্রুতসম্প্রসারণশীল সাম্প্রদায়িকতার যুগে সুনীতিকুমার ১৯২৭ সালে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন—একটির বিষয় ছিল ভারতীয় চিত্রশিল্প আর হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন, অন্যটির বিষয় প্রবন্ধটির শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট হবে: *Hindu Proselytisation and the Place of the New Converts in the Varnashrama Samaj*। প্রকাশ থাকে যে, "শুদ্ধি"র আন্দোলনে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজে যে-উপসর্গগুলি দেখা দিয়েছিল সেগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ নিয়ে রচিত হয়েছিল সুনীতিকুমারের ওই প্রবন্ধ। কোন্ প্রসঙ্গ সুনীতিকুমারের মেধা আর মননকে পরবর্তী কয়েক বছরের জন্যে অধিকার করে থাকবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই প্রবন্ধে। এই প্রসঙ্গটি হল হিন্দুধর্ম-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা হিন্দু সম্প্রদায়ের গৌরব আর রাষ্ট্র-শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চিন্তা। আগে বলেছি যে, ১৯২৬-এ কলকাতায় যে-দাঙ্গা হয় সেটা ছিল অসহযোগ আর খিলাফৎ আন্দোলনের পরে সংঘটিত সব দাঙ্গাগুলির মধ্যে হিংস্রতম। ওই বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুনীতিকুমারের *Origin and Development of Bengali Language* দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এইসমস্ত ঘটনা যে সুনীতিকুমারের চিন্তাভাবনাকে আন্দোলিত করছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সময় সুনীতিকুমারের কাছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এল রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী হবার জন্যে। ১৯২৭ সালের অগস্ট-সেপটেমবর-অকটোবর মাসে তিনি রবীন্দ্র-সন্নিধানে মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ আর শ্যাম-দেশ ভ্রমণ করেন। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে "প্রবাসী" পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যা অর্থাৎ ১৯২৭-এর অগস্ট-সেপটেমবর মাস থেকে ওই ভ্রমণের কাহিনী "দ্বীপময় ভারত" নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমেই "মডার্ন রিভিয়ু"তে প্রকাশ করেন *Siam and India* নামে একটি সচিত্র প্রবন্ধ এবং পরে *Some Ramayana Reliefs from Prambanan, Java* নামে আর-একটি প্রবন্ধ লেখেন "রূপম" পত্রিকাতে। সেই যে ১৯২৮ সালে *Siam and India* নামে প্রবন্ধটি লেখেন তারপর বহু বছর শ্যাম-দেশ বা বর্তমান থাইল্যানড সম্বন্ধে তিনি আর-কিছু লেখেন নি। তাঁর ভ্রমণকাহিনী যখন গ্রন্থাকারে ১৯৪০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাতে শ্যাম-দেশ ভ্রমণের কাহিনী স্থান পায় নি। চবিবশ বছর পরে যখন ১৯৬৪ সালে "রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ" গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তখন তার ভূমিকাতে সুনীতিকুমার লেখেন যে 'নানা কাজের চাপে' তিনি তিরিশের দশকে শ্যামদেশ ভ্রমণের কাহিনী লিখতে পারেন নি। তবে "প্রবাসী"তে "দ্বীপময় ভারত" নামেই ভ্রমণকাহিনীটি শুরু করেছিলেন বলে মনে হয় যে প্রথম থেকেই তাঁর

পরিকল্পনা ছিল শুধু দ্বীপময় ভারত ভ্রমণের কাহিনীই প্রকাশ করবেন এবং প্রতর ভারত তথা শ্যামদেশ বা থাইল্যানড ভ্রমণের কাহিনীকে প্রকাশিতব্য রচনার অন্তর্গত করবেন না।

ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, এককালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে অংশ সংস্কৃত-ভাষা-আশ্রিত হিন্দু সভ্যতা আর সংস্কৃতি দিয়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং যে প্রভাবের বহুতর প্রমাণ সুনীতিকুমার মালয়, সুমাত্রা, জাভা ও বলি দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন, শুধু সেই অংশে ভ্রমণের কাহিনীই প্রকাশিত আর প্রচারিত হল। এবং যে-অংশ বৌদ্ধ ধর্ম দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিল এবং যেখানে বৌদ্ধ জীবনধারা আজও বহুলাংশে জীবন্ত, সেই অংশে অর্থাৎ শ্যামদেশে কাহিনী তাঁর খাতাবন্দী হয়ে থাকল। তা প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে "বিশ্বভারতী পত্রিকা"র পৃষ্ঠাতে। মোটের উপর, কারণ যা-ই হোক, ঘটনা এই যে এই ভ্রমণের পরে দেশে ফিরে ১৯৩২ পর্যন্ত ইংরেজিতে তিনি যেসব প্রবন্ধ লেখেন তার অধিকাংশই তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক, একটি গৌড় ও মগধের শিল্প বিষয়ক, অন্যটি ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির উদ্ভব বিষয়ক, একটি রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "বাক্‌পতি" এবং অন্য দুটি হল "সার্চলাইট অ্যানিভার্সারি" সংখ্যাতে প্রকাশিত *Hindu Culture and how it Spread Abroad* (১৯২৯) এবং "প্রবুদ্ধ ভারতে" প্রকাশিত *Hindu Culture and Greater India* (১৯৩২)—শেষের প্রবন্ধটির পরিমার্জনা করে ১৯৩৭ সালে তিনি আবার "কালচারাল হেরিটেজ অভ ইনডিয়া" গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। ওই ১৯৩২ সালেই "উদয়ন" পত্রিকাতে "হিন্দু সভ্যতার পত্তন" এবং "বঙ্গশ্রী" পত্রিকাতে হিন্দু ভারতের নগর-প্রতীক "কাশী" নামে প্রবন্ধ দুটি লেখেন।

তাহলে কী দেখতে পেলাম? ১৯২৩-২৪ সালে সুনীতিকুমার উৎসাহের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলে প্রাক্-আর্য, প্রাক্-বৈদিক, প্রাক্-পুরাণ উপাদানের তাৎপর্য অনুসন্ধান করেছেন। এই উপাদানকে পরবর্তী কালে কোন্ দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজ দেখেছে তার পরিচয় পাওয়া যায় "রামায়ণ" বা "মহাভারতে"—বেদপাঠে ইচ্ছুক হয়েছিল বলে শম্বুকের গলা কেটে দিয়েছিলেন রাম, পাণ্ডবরা ছজন নিষাদকে নেশাগ্রস্ত করে ফেলে গিয়েছিলেন জতুগৃহে পুড়ে মরবার জন্যে এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, নিষাদ-পুত্রের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে নিয়েছিলেন স্বয়ং দ্রোণাচার্য। আজকাল যাদেরকে ইনডো-ইউরোপীয় বলে, তাদেরকে ভারতীয়রা আর্য বলে সম্ভ্রম জানিয়ে এসেছে। কিন্তু সুনীতিকুমারের প্রথম দিকের প্রবন্ধগুলিতে অনার্যদের গৌরবময় ভূমিকার কথা-ই পাওয়া যায়—হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর প্রথম প্রচারকদের তিনি অন্যতম।

তারপর ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হল সুনীতিকুমারের মহাগ্রন্থ *ODBL* এবং প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে পেলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্যে স্বদেশে-বিদেশে বিপুল প্রসিদ্ধি। কিন্তু সন্দেহ হয় যে, ওই বছরেই কলকাতায় যে-সাঙ্ঘাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল, তা তাঁর দেহে মনে গভীর ছাপ রেখে দিল। প্রাণে বেঁচে গিয়ে তিনি আজীবন বহন করেছিলেন পিঠের সেই জখমের ছাপ। ঘটনাবলীর পরিণামে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরাক্রান্ত প্রভাব সত্ত্বেও সুনীতিকুমারের চেতনা-ধারণা এখন থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মহিমায় সর্বাংশে আপ্লুত এবং সুনীতিকুমারের উদ্যমের বৃহত্তর অংশ ওই মহিমার প্রচারে আর ওই অতীত মহিমার বাস্তব ভিত্তি বর্তমান কালে পুনঃস্থাপনার প্রয়াসে নিযুক্ত।

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত "রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ" পাঠ করে এ-প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক যে কেন মূল ভূখণ্ড ছেড়ে সমুদ্রের ওপারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে হিন্দু- ধর্ম ও -জীবনধারা দু শতাব্দীতেই নিষ্প্রাণ আর বিশুষ্ক হল আর বৌদ্ধ-ধর্ম ও -জীবনধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবন্ত থাকল। এই প্রশ্ন কি ভ্রমণকালে সুনীতিকুমারের মনেও জেগেছিল? আর জেগেছিল বলেই কি তিনি এই প্রশ্ন যাতে তাঁর পাঠকসমাজের মনে না জাগে তার জন্যে 'নানা কাজের চাপ' উপেক্ষা করে শ্যাম-দেশ ভ্রমণের কাহিনী লেখার তাগিদ অনুভব করেন নি? বা তাগিদ অনুভব করলেও ওই প্রশ্নের কারণ জোগাতে দ্বিধা করেছিলেন? এসবই অনুমানের ব্যাপার। কিন্তু তাঁর রচনাবলী থেকে যেটা প্রমাণিত ব্যাপার সেটা হল এই যে স্পষ্টভাবে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁর চিন্তাভাবনা অধিকৃত ছিল হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্ম নিয়ে। তবে মনে রাখা ভালো যে এই পর্বভাগগুলি কখনই বিশুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ নয়। ১৯৩৬ সালেও "জর্নাল অভ দি গ্রেটার ইনডিয়া সোসাইটি" সিলভ্যাঁ লেভি স্মারক সংখ্যাতে সুনীতিকুমার *Non-Aryan Elements in Indo-European* অথবা "ভারতবর্ষ" পত্রিকাতে "ত্রিভুবনাদিত্য-ধর্মরাজ ক্যন-চচ-সাঃ"-র মতো প্রবন্ধ লিখেছেন। যাকে বলেছি একান্ত হিন্দুপর্ব তখনও তাঁর চিন্তাভাবনা এবং কাজের মধ্যে অহিন্দু উপকরণের আসা-যাওয়া চলতেই থাকে।

তবে মোটের উপর বলতে পারি যে, ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ "কালচারাল হেরিটেজ অভ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ-কাল পর্যন্ত সুনীতিকুমারের হিন্দুপর্বের যুগ।

হিন্দু-মুসলমান-ভারত

১৯৩৮ সাল থেকে সুনীতিকুমারের জীবনে নতুন পর্বের সূচনা হল। ১৯৩৮ সালে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যান প্রধানত তৃতীয় আন্তর্জাতিক ধ্বনিতত্ত্ব সম্মেলনে এবং কোপেনহাগেনে আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব সম্মেলনে যোগ দিতে। কোপেনহাগেনে অনুষ্ঠিত এই নৃতত্ত্ব সম্মেলনে যোগদান যে সুনীতিকুমারের জীবনে কত বড়ো ঘটনা তার সাক্ষ্য স্বয়ং দিয়েছেন দুখণ্ডে সম্পূর্ণ "ইউরোপ ১৯৩৮" গ্রন্থে। স্বদেশের সামাজিক আর সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণের জন্যে নৃতত্ত্ব তাঁকে দিল সাম্প্রতিকতম সরনজাম এবং সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলেন যে শুধু হিন্দুত্বের কুঞ্চিকা দিয়ে ভারতের ইতিহাসের সমস্ত রুদ্ধ দ্বারগুলি উন্মোচন করা যাবে না। ১৯৩৯ সালে "উদ্বোধন" পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৬ সংখ্যাতে যখন তিনি "মজম্ 'উল-বহ্‌রৈন" প্রবন্ধে দু সংস্কৃতির মিলনের কথা লিখলেন, তখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে ভারতীয়-তার সন্ধানে অ-হিন্দু উপাদানের মূল্যায়নেও তিনি উৎসুক। আবার "উদ্বোধন" পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫০ সংখ্যাতে তিনি "সূফী অনুভূতি ও দর্শন" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটির উপসংহারে পারস্যের অন্তিম সূফী মহাকবি নুরুদ্দীন জামী-র "রশ্মিরাজি"-নামক গ্রন্থ থেকে গদ্যময় একটি প্রার্থনা অনুবাদ করে দিয়ে সুনীতিকুমার মন্তব্য করেছেন, 'এই প্রার্থনাটি যেন উপনিষদের "অসতো মা সদ্‌গময়" মন্ত্রের একটি অনুভূতিময় ব্যাখ্যা।'

এখানে প্রকাশ থাকে যে ১৯৪২ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে এবং তার ফলে দেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নতুন পরিস্থিতি ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এই সময় জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্মল-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ., বার-এট-ল (শ্রীযুক্ত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বার-এট-ল, এম. পি মহাশয়ের পিতা) মহাশয়ের কাছে পাঁচটি প্রশ্নে হিন্দুধর্ম কাকে বলে জানতে চেয়েছিলেন। প্রাদেশিক হিন্দু মহা-সভার সভাপতি মহাশয় ওই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে দেওয়ার জন্যে সুনীতিকুমারকে অনুরোধ করেন। তার উত্তরে সুনীতিকুমার ইংরেজিতে যা লেখেন তা "হিন্দু-ধর্ম কাহাকে বলে?" শিরোনাম দিয়ে বাঙলায় অনুবাদ করে "ভারত সংস্কৃতি" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

করেন। সুনীতিকুমার হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এই প্রবন্ধের শেষে বিচারপতি স্যার আবদুল কাদিরের লেখা "দি কালচারাল প্রবলেম : অক্সফোর্ড প্যাম-ফ্লেটস অভ ইনডিয়ান অ্যাফেয়ার্স : নং ১" থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলাম ধর্মের সর্বজনীনতার কথা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি (সভাপতিকে তখন রাষ্ট্রপতি বলা হত) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক উপস্থাপিত ইসলাম ধর্মের 'মুখ্য বিষয়গুলির' কথা উল্লেখ করেছেন।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে একদা যে-সুনীতিকুমার ছিলেন একান্তভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ, তিনি ১৯৩৯ সাল থেকে ভারতবর্ষের ইতি-হাসে হিন্দুধর্ম আর ইসলামধর্মের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের সম্পর্ক এবং এ দুটি ধর্মের মধ্যে সদৃশতার কোনো ক্ষেত্র আছে কিনা এবং থাকলে সেই ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিতকরণে উৎসাহী হয়ে উঠছেন। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে উদ্যোগী হচ্ছেন হিন্দুধর্মের উদারতা, সর্বজনীনতা ও বিশেষভাবে ইসলামের সঙ্গে ধর্মের মুখ্য বিষয়গুলির সদৃশতার কথা প্রচারে, তাই মুসলমান ভদ্রলোকের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তরকে তিনি "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৪৩ সংখ্যাতে *What is Hinduism?* নামে প্রকাশ করেন। এর পর ১৯৪৫ সালে "প্রবুদ্ধ ভারত" গোল্ডেন জুবিলি সংখ্যাতে *Indianism or the Hindu Ideal and Humanity* নামে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রথম তিনি "ইনডিয়ানিজম্" বলে একটি নতুন শব্দ সৃষ্টি করলেন যার অর্থ করেছেন হিন্দু আদর্শের সঙ্গে মানবিকতার যোগফল।

প্রসঙ্গটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। হিন্দু আদর্শ অ-ব্যক্তিবিশেষনিষ্ঠ অর্থাৎ বুদ্ধ বা যীশু বা মহম্মদের মতো কোনো ব্যক্তিবিশেষের মাহাত্ম্যের উপর নির্ভর-শীল নয় এবং হিন্দু আদর্শ উচ্চ আধ্যাত্মিকতা-উদারতা ও সদাচারনিষ্ঠ, তবুও সাধারণভাবে মানবতা বা মানব-সমাজ উদাসীন। বলা যেতে পারে, হিন্দু আদর্শের সঙ্গে মানবতা আর মানবিকতাকে অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে মানুষরূপেই সব মানুষের সমান মূল্যবান বলে গণ্য করা, প্রত্যেক মানুষকে সমষ্টিগতভাবে অনন্ত ও সমগ্র মানুষরূপে কল্পনা করা, এবং সেই সমগ্র মানুষের জন্যে চিন্তাকে জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করা বিশেষভাবে উনবিংশ শতাব্দীর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা আর কাজের পরিণাম। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে—যখন সাম্প্রদায়িকতা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং যখন এই সাম্প্রদায়িকতার চাপে (১৯৪২ সালে লাহোরে পাকিস্তান উত্থাপিত ও গৃহীত হয়েছে) তখন সুনীতিকুমারের ভারত সম্বন্ধে চেতনা এক নতুন তাৎপর্যে উত্তীর্ণ হল। "হিন্দুত্ব" শব্দের আধারে আর সে তাৎপর্যকে ধরা গেল না। সুনীতিকুমারের ভারত-বর্ষে অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির মিলনে হিন্দু আদর্শের জন্ম ও বৃদ্ধি হয়েছে, আবার এই হিন্দু ভারতের সঙ্গে আরব-পারস্যের ধর্মচিন্তা ও সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে দুই মহাসাগরের মিলন-কাহিনী 'মজ্‌মউল-বহ্‌রৈন', আবার তার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে ইউরোপের মানবিকতা। এত রকম উপাদানের মিলিত পরিণামকে ব্যক্ত করার জন্যে চাই নতুন শব্দ আর সেই শব্দ হল 'ইনডিয়ানিজম'। এই ভারতীয়তা যেন মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবে সুনীতিকুমারের উত্তর।

পাশ্চাত্য মানবিকতার আদর্শকে স্বীকৃতি দিলেও এখন পর্যন্ত সুনীতিকুমারের ভারত-চেতনা বহুলাংশে ধর্মাশ্রিত। ব্যক্তিগত জীবনে এখনও তিনি প্রতিদিন ভোরে ঠাকুরঘরে স্তোত্র পাঠ করে শিবপুজা করেন। এখনও সব চিন্তার আগে তিনি ধর্মের কথাই চিন্তা করেন। কিন্তু তাঁর ধর্ম-চিন্তা এখন আর শুধু হিন্দু-ধর্মের চিন্তাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা অন্য ধর্মের প্রতি শুধুই শ্রদ্ধাশীল নয়, অন্য ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসু। "ইনডোইরানিকা"-র অকটোবর ১৯৪৬ সংখ্যাতে তিনি *Islamic Mysticism : Iran and India* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তুলনা-মূলক ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে এটি এক অসাধারণ মূল্যবান প্রবন্ধ, যার পেছনে আছে বহু-পরিশ্রম-লব্ধ ব্যাপক গবেষণা ও দুদেশের ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে গভীর অনুধ্যান এবং নিঃসন্দেহে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম। ইসলামের রহস্যময় অধ্যাত্মচর্চা প্রকৃতপক্ষে ইরানের জরথুস্ট্রীয় দর্শন, আরবের ইসলাম এবং ভারতের অদ্বৈতবাদের যোগাযোগে বিকশিত বিশ্ব-মানবের এক মহান উত্তরাধিকার এবং বিশ্বমানবের মহান উত্তরাধিকার রূপেই ইসলামের রহস্যময় অধ্যাত্মচর্চাকে ওই প্রবন্ধে সুনীতিকুমার উপস্থাপন করেছেন। এই প্রবন্ধেই তিনি প্রথম ইঙ্গিত দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-র কল্পনার পেছনে ইসলামের মরমি দর্শন-সাহিত্যের প্রেরণা থাকা সম্ভব। পরে তিনি বিষয়টিকে বিস্তৃত করেছিলেন[৫] এবং আরও বিশদ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।[৬] যাহোক, অহিন্দু ভারতীয় ধারার আর-একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হল *Al-Biruni and Sanskrit* যা ইরান-সোসাইটির অল-বীরুনী স্মারকগ্রন্থে ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ভারতের অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থে গজনীর মাহমুদ হিন্দুদের সঙ্গে জড়িত ভাষা-শিল্প-সংস্কৃতি-সভ্যতা সমস্ত কিছুর বিরোধী বর্বর-রূপে চিত্রিত। এই প্রবন্ধে সুনীতিকুমার জনপ্রিয় মতের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে অল-বীরুনীর পৃষ্ঠপোষক মাহ-মুদের নিন্দায় উচ্ছ্বসিত হন নি, বরং মাহমুদকে স্থাপন করেছেন তথ্যের উচ্চ বেদীর উপরে। এখানে বলে নিই যে আজও অনেক জনগোষ্ঠী ভাষা এবং লিপির স্বীকৃতির জন্যে প্রাণ বিপন্ন করে সংগ্রামে লিপ্ত। কারণ ভাষা এবং লিপির স্বীকৃতির সঙ্গে তার ব্যবহার-কারীদের মর্যাদার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ফিরে আসি মাহমুদের প্রসঙ্গে। লাহোরে মুদ্রিত মাহমুদের মুদ্রাগুলিতে দেখা যায় যে ইসলামের রীতি অনুসারে এক পিঠে আরব্য লিপিতে 'লাইলাহা ইল্লাহাহ মহম্মদ রসুল' অন্য পিঠে সংস্কৃত ভাষাতে ও নাগরী লিপিতে 'অব্যক্তম্ একম্ মুহম্মদ অবতার' লেখা। সুনীতিকুমার লিখছেন,

'One wonders how Mahamud of Ghazna, who spent thirty years of his life in fighting the Hindus, made this great allowance for his newly conquered Hindu subjects by bring-ing to them the message of Islam through their own language; and in giving their language a place on the coins of the realm; further he seemed to stabilize them in their nationalism.'

মাহমুদের এই বিজিতদের ভাষা-ও-লিপিকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দানের দৃষ্টান্ত বর্তমান গণতান্ত্রিক ভারতের জন্যেও অনুকরণীয়। সেই সে যুগে মাহমুদ এ কাজ কেন করেছিলেন? সুনীতিকুমার বলেছেন, হয়তো 'Political Sagacity'র জন্যে কিংবা হয়তো 'a spontaneous gesture of magnanimity or liberality in ideas'-এর জন্যে। আমরাও প্রশ্ন করতে পারি যে, যেখানে সাধারণ ভাবে ঐতিহাসিকদের প্রবণতা হচ্ছে মাহমুদকে বর্বর হিংস্র মানুষ হিসেবে অঙ্কনের, সেখানে সুনীতিকুমার কেন মাহমুদের মধ্যে উদার এবং মহান মানুষের সন্ধান করছেন? স্পষ্টতই হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ আর সংস্কার থেকে সুনীতিকুমার বহু দূরে চলে এসেছেন—ভারতের ইতিহাসকে তিনি এখন এক সমন্বয় ও সংহতি সাধনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন।

বহু জাতি, বহু সংস্কৃতি ও ভারততীর্থ

আগে বলেছি যে ১৯৩৮ সালে ইউরোপ ভ্রমণ সুনীতিকুমারের জীবনে নতুন পর্বের সূচনা করে। আমার মনে হয়, এই ভ্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

ঘটনা ছিল কোপেনহাগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিক কংগ্রেসে যোগদান। এই নতুন পর্বে অ-হিন্দু ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, এবং সেই আগ্রহের পরিণামে তাঁর ভারতচেতনা কিভাবে রূপান্তরিত হচ্ছিল তা সংক্ষেপে উপরে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ইউরোপে লব্ধ নৃতাত্ত্বিক সরনজামকে অর্থাৎ মানুষের জাতিগত শারীরিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক বিজাকে এই নতুন পর্বে তিনি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করলেন সে-কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এই নতুন সরনজামকে তিনি প্রথম অব্যর্থভাবে প্রয়োগ করলেন তাঁর প্রিয়তম দিব্য-কল্পনার বংশ- বা জাতি-বিচারে।

কথাটা আর-একটু খুলে বলি। সুনীতিকুমারের প্রিয়তম দিব্য-কল্পনা ছিল শিব বা মহেশ্বর। এককালে তিনি শিবরাত্রিতে উপবাস, জাগরণ, পাঠ-পূজা ইত্যাদি সবই নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন। এই বলে তিনি নিজের পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন : 'মাতা মে পার্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ, স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।' শিব অনার্য দেবতা, পরে আর্যদেবতা রুদ্রের সঙ্গে তাঁকে মেলানো হয়েছে। মহাভারতে শিব চিত্রিত হয়েছেন কিরাতরূপে। 'যুগবাণী'র শারদীয় ১৩৫৩ সংখ্যাতে সুনীতিকুমার "পিতা শিব, উমা মাতা" শিরোনামে একটি প্রবন্ধে শিব-উমা কল্পনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নন্দলাল বসু শিব-উমার একটি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন সুনীতি-কুমারকে যেটি তিনি শ্লেট-পাথরে কেটে ঘরে টাঙিয়ে রাখতেন।

শিবের কল্পনার সঙ্গে কিরাত- বংশের বা-জাতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। প্রাচীন ভারতে যাদেরকে কিরাত বলা হত, তাদেরকেই একালে ইনডো-মোঙ্গোলয়েড বলে। এই ইনডো-মোঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর পরিচয় এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর সংস্কৃতিতে তাদের কীর্তি, গুরুত্ব, ভূমিকা এবং স্থানের গবেষণা দিয়ে সুনীতিকুমার ভারতবর্ষের জনোপকরণের প্রকৃত সংজ্ঞা আবিষ্কারে অগ্রসর হলেন। এই গবেষণাগ্রন্থটির নাম *Kirata-Jana-Kriti* এবং এক হিসেবে *ODBL*-এর মতোই *KJK* বা 'কিরাত-জন-কৃতি' আধুনিক ভারতীয় মনীষার এক স্মারক-স্তম্ভ। এই গ্রন্থের শুরুতেই সুনীতিকুমার লিখেছেন,

'The civilization of India is the joint creation of her diverse peoples, Aryan, Dravidian, Austric and Mongoloid. The Aryan bases have always received the greatest attention and rightly so. A study of Dravidian hertitage has now been taken up with increased interest since beginnings in this direction were made by Caldwell over a century ago. The Austric elements too are now being investigated, and we are realising its importance. The Mongoloid contribution has not yet been seriously studied as an element in Indian history and civilisation.'

ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থ পাঠ করলেই কিরাত বা মোঙ্গোলয়েডদের সম্বন্ধে ভারতীয় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানত উত্তর-পূর্ব ভারত কিরাত-অধ্যুষিত দেশ, কিন্তু ভারতের ইতিহাসগুলিতে এই দেশের বা কিরাতদের জীবন তথা সংস্কৃতির স্থান কতটুকু? পশ্চিম ও উত্তর ভারতের শিক্ষিতদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা সিকিম বা নাগাল্যান্ড ভারতের অন্তর্গত কিনা, তা-ই জানেন না; স্বভাবতই এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের ইতিহাস জানার কথাই ওঠে না। এদিক থেকে ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় সুনীতিকুমার একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফেরালেন। আচার্য যদুনাথ সরকার "কিরাত-জন-কৃতি" পড়ে অভিনন্দন জানালেন,

'It ought to serve as a road-charter for future workers on the cultural history of these people.'

সুনীতিকুমার "কিরাত-জন কৃতি" শুরুই করেছেন রবীন্দ্রনাথের নাম এবং তাঁর "ভারততীর্থ" কবিতাটির উল্লেখ করে। আর শেষ করেছেন এভাবে :

'The Kiratas or Indo-Mongoloids, from the Vedic time onwards, have been the fourth basic element in the formation of the Indian people, and we find them taking their share in Hindu history, beginning with the battle of Kurukshetra, from the 10th century before Christ, Kirata or Indo-Mongoloid influences may have affected the life and religion of the Vedic Aryans as well. The question of Kirata influences in the life of the Pandavas still remains an open question. One of the most outstanding international personalities of both India and the world, Buddha, who is among the greatest thought-leaders and teachers of mankind, and who embodies himself the principles of *Ahimsa, Karuna* and *Maitri*—of Non injury, Mercy and Charity, which are so characteristic of India, was, for ought we know, of pure or mixed Indo-Mongoloid origin; and through him and other personalities we have a material and spiritual kinship with the Buddhist Mongoloid World'.

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ইতিহাস এবং পরিচয় অন্বেষণের ধারাতে সুনীতিকুমার যে একাই বহু গবেষকের কাজ করেছেন তা এই ধারাতে রচিত তাঁর *The Place of Assam in the History and Civilisation of India* (1955), *Dravidian* (1965), *The People Language and Culture of Orissa* (1966), *Religion and Cultural Integration of India : Atombapu Sarma of Manipur* (1967) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি থেকে সুস্পষ্ট। এই-সমস্ত রচনা-গুলির থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের অধি-বাসীদের পরিচয় অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে তিনি সাধারণ ও সামগ্রিক ভাবে বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির সংমিশ্রণে আর সমন্বয়ে উদ্ভূত "ভারতবাসী" কথাটির অর্থ ও সংজ্ঞা অনুধাবনের চেষ্টা করছিলেন। এই চেষ্টাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল *Indianism and Indian Synthesis* যা তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়-আয়োজিত ১৯২৭ সালের কমলা দেবী বক্তৃতামালা হিসেবে ১৯৫৯ সালে রচনা করেন। কিন্তু ওই গ্রন্থের প্রসঙ্গে আসার আগে আরও দুটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করব—একটি হল এশিয়াটিক সোসাইটির 'জর্নালে' ১৯৫০ সালের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত *Krishna Dvaipayana Vyas and Krishna Vasudeva Vrishni* এবং অন্যটি হল ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত "হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ দি ইনডিয়ান পীপল" নামক বিখ্যাত গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডের জন্যে লেখা *Race Movements in the Pre-historic India.*

এর আগে অসম সাহিত্যসভা আয়োজিত প্রতিভা দেবী বক্তৃতামালারূপে ১৯৪৭ সালে রচিত "কিরাত-জন-কৃতি"-র শুরুতেই সুনীতিকুমার লেখেন, 'The Aryan bases have always received the greatest attention and rightly so.' তিন বছর পরে "কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস অ্যান্ড কৃষ্ণ-বাসুদেব বৃষ্ণি" প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে লেখেন, 'Sanskrit as the exponent as well as symbol of Hindu culture became responsible for giving to the Aryan element a predominance which was more than its due.' উদ্ধৃতি দুটির তাৎপর্য বিবেচনা-যোগ্য। সুনীতিকুমার ১৯৪৭ সালে লিখছেন যে ভারতীয় জনোপকরণের মধ্যে আর্য উপকরণ প্রাপ্য হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু ১৯৫০ সালে

তাঁর মত পালটে গেছে এবং তখন লিখছেন যে আর্য উপকরণ এতকাল প্রাপ্যের বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন লক্ষ করার পরে প্রশ্ন জাগে : বিভিন্ন জনোপকরণের মধ্যে সংমিশ্রণ আর সমন্বয় প্রকৃতিচালিত অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত একটা ব্যাপার, নাকি ওই প্রক্রিয়া কোনো চিন্তামেতার সচেতন প্রচেষ্টা এবং সুপরিকল্পিত সাধনার ব্যাপার? সুনীতিকুমার বলেছেন যে, দুটি ব্যাপারই সমান সত্য। এক কৃষ্ণ আর্য ঋষির ঔরসে নিকৃষ্টজন্ম কন্যার গর্ভে বিচ্ছিন্ন ভূমিতে অর্থাৎ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করে দ্বৈপায়ন নামে ও বেদগুলি সংগ্রহ ও সংকলন করে বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ; অন্য কৃষ্ণ বৃষ্ণি গোত্রে বাসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে বাসুদেব নামে, যুদ্ধের আগে শান্তির দূতরূপে ও যুদ্ধকালে সারথি বা পরিচালকরূপে প্রসিদ্ধ। দুজনে দু-গোষ্ঠীর মানুষ, কিন্তু দুজনের মিলন হয়েছে মহাভারতে এবং দুজনেই সংগ্রহ ও সংহতির পরিকল্পনারচয়িতা।

আর স্বভাবের গুণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমন্বয়ের যে-প্রক্রিয়া তার বিবরণ সুনীতিকুমার দিয়েছেন *Race Movements in the Pre-historic India* প্রবন্ধটিতে। এই অসাধারণ প্রবন্ধটিতে আমরা চলচ্চিত্রের বিশাল দৃশ্যপটের মতো দেখতে পাই ভারতবর্ষের বিচিত্র বিস্তার, তার নানা প্রবেশপথ দিয়ে ক্ষণে-ক্ষণে নতুন-নতুন জনগোষ্ঠীর আগমন, কোনো-কোনো গোষ্ঠী প্রান্তবর্তী ক্ষেত্রগুলিতেই স্থান নেয় ও পরের নবাগতদের সঙ্গে বোঝাপড়ার দায়িত্ব নেয়, আবার কোনো গোষ্ঠী পাহাড় জঙ্গল নদী মরুভূমি অতিক্রম করে চলে যায় দেশের অভ্যন্তরে ও অন্য-অন্য প্রান্তে, কখনও বা আগন্তুক গোষ্ঠীর কোনো পুরুষকে পূর্বতন অধিবাসীর কোনো নারী নাম-না-জানা ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে, কখনও বা আগন্তুকদের নেতা পূর্বতনদের পুরি-পুর অগ্নিসংযোগ করে ধ্বংস করে পুরন্দর নাম পায়, কখনও বা পুরন্দর বলপূর্বক পূর্বতনদের নারী হরণ করে তাকে অধিকার করতে গিয়ে থেমে যায়, তার কাছে প্রেম প্রার্থনা করে এবং তারপর সে-কাহিনী অন্য কোনো রূপ নিয়ে কোনো মহাকাব্যের বিষয়ে পরিণত হয়। *Race Movement in the Pre historic India* প্রবন্ধের সীমিত আধারে সুনীতিকুমার বহু মহাকাব্য আর বহু পুরাণের অনেক রূপক-কাহিনীর পেছনে হারিয়ে-যাওয়া আর লুকিয়ে-থাকা ঐতিহাসিক সূত্রগুলিকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন।

মনে হয় ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫—এই দশ বৎসরে সুনীতিকুমার সংমিশ্রণ এবং সহনশীলতার মধ্যেই ভারতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এবং প্রাণপ্রৈতির গুপ্ত রহস্যটি আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে রচিত ও প্রদত্ত বক্তৃতামালা *Indianism and the Indian Synthesis*-এ যে-কথাটা তিনি আগে বহুবার বলেছেন সে কথাটাকে আরও একবার সজোরে ঘোষণা করেছেন, 'The Indian people is a Mixed people in Blood, in Speech and in Culture.' এখানেও "সংস্কৃতি" কথাটার মধ্যেই "ধর্ম" কথাটাও আছে। এর একটু পরেই লিখেছেন যে আর্য ম্লেচ্ছ ইত্যাকার মানুষে-মানুষে ভেদ কোনো উচ্চ চিন্তার ফল নয়, ক্ষমতা আর সম্পদের লোভ থেকেই ভেদাভেদের সৃষ্টি। এই ভেদাভেদের চিন্তা আমাদেরকে জীবনের গভীরতর বোধগুলির প্রতি অন্ধ আর অসাড় করে দেয় :

'Just as no man is an island unto himself, so is no race or people or country basically separated or isolated from the others : We are linked with each other inextricably.'

সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৫০০ পর্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এই পর্বে ভারতীয় মানুষ অদৃশ্য কোনো শক্তির সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক অতিক্রম করে সেই অদৃশ্য শক্তির স্বরূপকে বুঝতে চাইছে, এই চেষ্টাতে জ্ঞান আর ভক্তির, কর্ম আর যোগের ধারণা গড়ে উঠছে

এবং এই চেষ্টাও একসঙ্গে মিলে ধারণাগুলি গড়ে তোলার বা সৃষ্টির কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মানুষ ক্রমে-ক্রমে আবির্ভূত হয়েছে; বহু নৃতাত্ত্বিক জাতির সংমিশ্রণে এই মানুষের উদ্ভব; অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকারেই তার স্বাতন্ত্র্য; সদ্ভাবের বন্ধনেই সে স্বাধীন; মনের স্বাধীনতাতেই এই মানুষের মহিমা। এই মানুষ-ই "ভারতীয় মানুষ"। দ্বন্দ্ব নয়, ছন্দই তার জীবনের আনন্দ।

এক মহান ছন্দের উপলব্ধি নিয়ে 'ভারতীয় মানুষে'র পরিপূর্ণ আবির্ভাবকে সুনীতিকুমার বলেছেন, 'One of the most remarkable phenomena in the evolution of Humanity.' এই মহান ছন্দের চিন্তাধারা এবং জীবনধারাকেই সুনীতিকুমার মিলিতভাবে বলেছেন "ভারতীয়তা" বা "ভারতধর্ম"। সমন্বয় এবং সংহতি, গ্রহণশীলতা এবং সহনশীলতা-ই "ভারতধর্মে"র মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্ব প্রাচীন যুগে প্রযুক্ত হয়েছে নৃতাত্ত্বিক জাতিগুলির ক্ষেত্রে, মধ্যযুগে প্রযুক্ত হয়েছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। মহান ভারতীয়তার সংস্পর্শে এসে ইসলামের উত্তপ্ত জগৎ-জিগীষাও শীতল এবং শান্ত হয়ে গেছে, বিজেতারা ভারতীয়তাকেই স্বীকার করে নিয়েছে, যেমন একদা পুরন্দর-উপাসক আর্যরা গ্রহণ করেছিল বিজিতদের সংস্কৃতি আর দেবদেবী। মধ্যযুগে মুসলমানরা যদি ভারতীয়তাকে স্বীকার না করত তাহলে হয়তো মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুরূপ কিছু এখানেও ঘটত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী মুসলমান সমস্ত ভারতীয়কেই মুসলমান করত আর অমুসলমান ভারতীয় বলে ভারতবর্ষে, বিশেষত উত্তর ভারতে, কেউ থাকত না। সুনীতিকুমার এই গ্রন্থে লিখছেন,

'The 19th century civilisation, particularly of North India, is based on this Union of the Two Oceans in the shape of Islam and Hindu cultures—the basis was of course was fundamentally of the soil. On this texture, which was made up of the warp and the woof of these two cultures, Hindu-Indian, and Muslim-Iranian, we have further addition of elements from the culture of the West.'

সুনীতিকুমার "কিরাত-জন-কৃতি" গ্রন্থটির শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" কবিতাটির উল্লেখ করেছেন, আবার "ইনডিয়ানিজম অ্যাণ্ড দি ইনডিয়ান সিনথেসিস" গ্রন্থের শেষে 'সিদ্ধান্ত' রূপেও "ভারততীর্থ" কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করেছেন বাঙলা ভাষায় রোমানলিপিতে, আর সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছেন। ছন্দের বন্ধনে রবীন্দ্রনাথ যে-বক্তব্যকে অনন্য কাব্যে প্রকাশ করেছেন, সেই বক্তব্যকেই সুনীতিকুমার তথ্যে আর তত্ত্বে প্রকাশ করেছেন এই অমূল্য গ্রন্থে। বক্তব্যটি বহুজ্ঞাত হলেও পুনঃপুন প্রণিধানযোগ্য, কেননা ভারতের প্রাণরক্ষার জন্যে এইটেই শেষ কথা :

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু, মুসলমান ;
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান ;
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

নির্দেশিকা

১। জীবন-কথা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ১৯৭৩, পৃ ২৫৫।
২। বর্তমান প্রবন্ধলেখককে লেখা পত্র, অপ্রকাশিত।
৩। জীবন-কথা—ওই, পৃ ১১৭।
৪। *World Literature and Tagore* by S. K. Chatterji, Calcutta 1971, p 185.
৫। ওই, pp 195-198.
৬। জীবন-কথা—ওই, পৃ ২২৭-২৩৬।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত রচনা

[স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ১৯৫১ সালে মফসসলের কয়েকজন ছাত্র "জলার্ক" নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করে আচার্য সুনীতিকুমারের কাছে একটি প্রবন্ধ প্রার্থনা করলে তিনি নিম্নমুদ্রিত প্রবন্ধটি লিখে দেন। উদ্যোক্তাদের ইচ্ছে ছিল একটি বিশেষ সংখ্যা করে প্রবন্ধটি প্রকাশের। কিন্তু সেই বিশেষ সংখ্যা বেরোনোর আগেই "জলার্ক"র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

সুনীতিকুমারের ব্যক্তিত্বের কতকগুলি দিক এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। প্রথমেই লক্ষ করার বিষয় : স্কুল-ছাত্রদের ডাকেও তিনি কিভাবে সাড়া দিয়েছেন, অর্থাৎ বিদ্যার্থীদের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ। তারপরে লক্ষণীয়, হিন্দুসংস্কৃতি থেকে বিশ্বমানবের এবং বিশ্বমানব থেকে নূতন সত্যের জন্য নিত্যসন্ধানী মনের প্রকাশ। সবকিছুর উপরে লক্ষণীয় তাঁর সংস্কারমুক্ত যুক্তিবিচারপ্রবণ মন।

প্রকাশ থাকে যে, ১৯৫১ সালের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতসংস্কৃতি সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের ধারণা অনেক বিবর্তিত হয়েছিল যার প্রকাশ দেখা যায় তাঁর পরবর্তী রচনাবলীতে।

আলোচ্য অপ্রকাশিত রচনাটি সুব্রজিৎ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদক]

ভারতসংস্কৃতি বলিতে মুখ্যতঃ ভারতের হিন্দুসংস্কৃতিকেই ধরিতে হয়। বাহির হইতে আগত মুসলমান সংস্কৃতির (যাহা হইতেছে প্রধানতঃ ইরাণী সংস্কৃতি, তাহার) বহু বস্তু ও ভাব এই ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি আত্মসাৎ করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। যেমন উত্তরভারতের শিল্পে ও সঙ্গীতে। কিন্তু এই বিদেশাগত উপাদানকে আমরা হজম করিয়া নিজেদের করিয়া লইয়াছি। ভারতীয় মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করিতে বসিলে এই-সমস্ত বিদেশী উপাদানকে ধরিতে হয় বইকি।

ইহার কারণ রহিয়াছে। পাল ও সেন রাজাদের পর তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের ঝড় বহিয়া গেল। দেশে যখন ব্রাহ্মণ্য- ও বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হিন্দু রাজা ছিলেন, ভারতের বাহিরের দেশের প্রতি অথবা ধর্মগুরুর দিকে তাকাইয়া থাকে এমন বিদেশীয় ধর্ম যখন দেশে ছিল না, তখন দেশের জনসাধারণের প্রতি শিক্ষিত বা অভিজাত সমাজের দৃষ্টি ততটা আকর্ষিত হয় নাই। অশিক্ষিত জনসাধারণ চিরাচরিত রীতি অনুসারে গ্রাম্য ধর্ম পালন করিত; তাহাদের মধ্যে ধর্মপিপাসা জাগাইবার এবং মিটাইবার জন্য যোগী সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু ছিল; তাহারা নিজেরাও নানা পর্ব-দিবস পালন করিত।

মুসলমান প্রচারক আসিলেন; তাঁহার পিছনে ছিল মুসলমান রাজার প্রচণ্ড শক্তি; মুসলমান ধর্ম সহজ-বোধ—তাহাতে হিন্দু অর্থাৎ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সূক্ষ্ম intellectualism বা আধি-মানসিকতা নাই বলিয়াই তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে আপাত-গ্রহণীয় ছিল। তুর্কী-বিজয়ের দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে সমস্ত উত্তর-ভারতময় মুসলমান ভাবজগতের প্রতাপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের জীবনে অনুভূত হইতে লাগিল।

কিন্তু মুসলমান সংস্কৃতি তাহার বিশিষ্ট আরব মনোভাব বজায় রাখিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোনও নূতন ভাবধারা দিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না যাহাকে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অবশ্য জীবনের বাহ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে, বাস্তুশিল্পে এবং সুকুমার শিল্পে, অশনে বসনে, যুদ্ধ- ও শাসন-পদ্ধতিতে এবং ধর্মের বা ধর্মানুষ্ঠানের

কতকগুলি রীতিপদ্ধতিতেও, মুসলমান প্রভাব ভারতের হিন্দু জীবনের উপরে তাহার ছাপ দিয়াছে। কিন্তু আরব্য ইসলামিক সভ্যতার নিজরূপে অবস্থানের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতে গঠনমূলক তেমন কিছু পাই নাই। সূফী মত হইতে মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও সন্তবিচার কিছু-কিছু জিনিস আত্মসাৎ করিয়াছে আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে সহজ-বোধ্য ভক্তিমার্গ পুনরায় প্রকটিত হইয়াছে, 'নাম-ধর্ম' প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু বহু গোঁড়া মুসলমান সূফীমতকে শুদ্ধ ইসলামের পরিপন্থী বলিয়া বর্জন করেন; আবার অনেকে সূফীমতেই ইসলামের চরম পরিণতি দেখেন। যাহা হউক, 'নাম-ধর্মে'র নানা সাধক দেখা দিলেন: রামানন্দ কবীর প্রমুখ উত্তরভারতের সন্তমার্গী সাধুগণ; বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্যদেব; এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তৎশিষ্য ও অনুশিষ্য শিখ গুরুগণ। কিন্তু ইহা হইতেছে মুখ্যতঃ ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিরই কথা।

হিন্দু সংস্কৃতিতে যতদিন প্রাণ ছিল ততদিন বাহিরের জিনিস গ্রহণ করিয়া তাহা হজম করিবার শক্তি তাহার ছিল। এই হিসাবে মুসলমান সভ্যতার কোনও-কোনও উপাদান হিন্দু-সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়াছে—হিন্দু সভ্যতাকে পুষ্ট করিয়াছে, বিধ্বস্ত করে নাই। এই প্রাণ এখনও লুপ্ত হয় নাই—বাহিরের বহু জিনিস হিন্দু সভ্যতাকে লইতে হইবেই এবং হিন্দু সভ্যতা তাহা লইতে পারিবেও।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য কিছু আছে কিনা, সে বিষয়ে তিনজন মনীষী সার্থক বিচার করিয়াছেন—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণণ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে মানব এবং শাশ্বত সত্তা (যাহা মানবজীবনের পিছনে বিদ্যমান বলিয়া বহু মানবের ধারণা আছে) সম্বন্ধে ভারতের বোধ ও বিচার এখনও বিশ্বমানবের কল্যাণবহ হইতে পারে, এই বিশ্বাসে ইঁহারা লিখিয়াছেন।

আমার মনে হয়, জীবনের পিছনে যে শাশ্বত সত্য আছে তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া বা তাহার অবহেলা করা ভুল—materialism বা জড়বাদ-ই শেষ কথা নয়। ইহাদের কথা যুক্তিযুক্ত কিনা দেখিলে ক্ষতি কি? আমার নিজের বিশ্বাস, ভারতের এই বোধ ও বিচার আধুনিক যুগে মানবকল্যাণের জন্য নানা প্রকারের যেসব প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহার পরিপন্থী নহে—বরঞ্চ তাহার পরিপোষক। সব জিনিস বাজাইয়া লইয়া দেখা চাই।

যদি একটা মত জোর করিয়া প্রচার করা হয় সেখানে তাহার বিপক্ষে যাহা বলা যায় তাহাও সঙ্গে-সঙ্গে দেখা চাই। কম বয়সে সব বিষয়ের সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি আসে না। সমগ্রভাবে জিনিসটাকে না বুঝিলে তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু সমগ্রভাবে বোঝা হইতেছে শিক্ষা- আর অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ—সেই জন্য কম বয়সে অনেক কিছু পড়িতে বারণ করেন অনেকে। তবে আমি বলি, কোনও কিছু সম্বন্ধে পাঠ করা দোষাবহ নহে। সবকিছু পড়া চাই, জানা চাই, বুঝিবার চেষ্টা করা চাই এবং এই আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, সত্তাবের পোষক, উন্নত, মঙ্গলাবহ, তাহা গ্রহণ করিব। মনকে নূতন জিনিস গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত রাখা উচিত—মনের গাঁট খুলিয়া ফেলা উচিত, মনের দরজা জানালা সর্বদা খুলিয়া রাখা উচিত, যাহাতে বাহিরের আলোর ঝলক কখন কোথা হইতে আসিবে তাহা ব্যাহত হইয়া ব্যর্থ না হইয়া যায়। সার সত্য করতলগত হইয়া গিয়াছে, আর কিছু শ্রেয়ঃ বা প্রেয়ঃ নাই, এই অন্ধ বিশ্বাস আসিলে, আত্মহত্যাই হইবে।

বেশরম

সাদাত হাসান মনটো

অনুবাদ ॥ কিরণশঙ্কর মৈত্র

ভোলু আর গামা দু ভাই। গামা বড়ো, ভোলু ছোটো। দুই ভাইই খুব পরিশ্রমী। সারাদিন কাজ করে তারা পয়সা কামায়। ভোলু কাজ করে দুতোর মিস্ত্রির। সকালে বেরিয়ে সন্ধেয় সে ঘরে ফেরে, উপার্জন তিন-চার টাকা।

গামা ফিরিওয়ালা—নানা ধরনের নিত্য-প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে সে-ও সারা-দিন শহরের রাস্তায় ফেরি করে। তার উপার্জনও ভোলুর মতো তিন-চার টাকা। কিন্তু গামার খুব বদভ্যাস, খুব মদ খায় সে। রোজ সন্ধেয় সে দীনার ভাঁটিখানায় গিয়ে দেশী মদ খাবে। সবাই তার এই পানাসক্তির কথা জানে।

ভোলু তার দু বছরের বড়ো ভাইকে এই কু-অভ্যাস ছাড়বার জন্যে অনেকবার বলেছে। বলেছে—গামার এই স্বভাবটা খুবই খারাপ। সে বিয়ে করেছে, শরাবের পেছনে এইভাবে পয়সা বরবাদ করা ঠিক নয়। এই পয়সা সংসারে খরচ করলে তার ভাবীর একটু সুরাহা হবে। গামা কি তার বিবিকে ছেঁড়া-ফাটা কাপড়ে দেখতে ভালোবাসবে? কিন্তু গামা কোনো কথাতেই কান দেয় না। ভোলু যখন দেখে যে তার কথায় কোনো কাজ হচ্ছে না তখন সে চুপ করে যায়।

তারা দু ভাইই নিজেদের মুলুক ছেড়ে এই শহরে এসেছে। একটা বড়ো বাড়ির লাগোয়া নোকর-চাকরদের কতকগুলি কুঠুরি। অন্যদের সঙ্গে তারাও দোতলার একটি অংশ জবরদখল ক'রে বসে গেছে।

শীতকালটা এখানে আরামেই কেটে যায়, কিন্তু গরম পড়তেই খুব অসুবিধা। রাতে গামা বিবিকে নিয়ে ছাতে শুতে যায়, কিন্তু ভোলু কী করে? গামা তার বিবিকে নিয়ে খোলা ছাদেই শোয়, তাদের চারধারে কোনো আব্রু নেই। শুধু গামাই সস্ত্রীক এইভাবে শোয় না, সব শাদি-শুদা মানুষদেরই এই একই পরেশানি। এদের মধ্যে কালান-ও রয়েছে।

সেদিন রাতে শোবার আগে কালান ছাদের

কোণে তার এবং তার বিবির খাটিয়ার চারদিকে কয়েক টুকরো চটের পরদা টানিয়ে দিল। এইভাবে সে আব্রুর ব্যবস্থা করল। কালানের দেখাদেখি অন্যান্য সবাই-ও চটের পরদা লাগাল। ভোলু তার ভাই আর ভাবীর খাটিয়ার চারিদিকে বাঁশ আর দড়ি দিয়ে এই পরদা লাগাতে মদত দিল। পরদা টানাবার ফলে হাওয়ার আসা-যাওয়া খানিকটা কমে গেলেও সব দিক দিয়ে, এটাই সবার কাছে সন্তোষজনক মনে হল।

গরমের দিনে সবার সঙ্গে ছাদে শুতে গিয়ে ভোলুর মেজাজ বিস্ময়করভাবে বদলে যেতে থাকে। আগে তার বিয়ে-শাদি করার ইচ্ছে ছিল না। সে ঠিক করেছিল—ওইসব ঝামেলার মধ্যে সে কখনও যাবে না। গামা যখনই তার শাদির কথা তুলত—সে বলত—'না ভাইয়া, আমি ওইসব ঝুট-ঝামেলার মধ্যে নেই।' কিন্তু গরমের দিনে রাতে সবাইয়ের সঙ্গে ছাদে শুতে শুরু করবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তার মনের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। তারপর একদিন মরিয়া হয়ে সে দীনার ভাঁটিখানায় গিয়ে বড়ো ভাই গামাকে ধরল—'ভাইয়া, আমাকে একটা বিবি এনে দাও, নয়তো আমার দিমাগ খারাপ হয়ে যাবে।'

গামা বললে—'তুই কি মজাক করছিস?'

ভোলু খুব গুরুতরভাবে বললে—'বিলকুল না। তোমার মালুম নেই গত পনেরো দিন ধরে আমার চোখে নিদ আসছে না।'

'কেন? ক্যায়া হুয়া?'

'কী হয়েছে? কেন তুমি বুঝতে পার না? রাতে ছাদে যখন শুতে যাই—ডাইনে, বাঁয়ে—কিছু না কিছু ঘটছে। সব আজীব বাতচিত, আওয়াজ—এর মধ্যে কারোর নিদ আসে?'

গামা তার পুরুষ্টু গোঁফ নাচিয়ে হা হা করে জোরে হেসে উঠল। ভোলুর লজ্জা লাগলেও আবার বলতে লাগল—'ওই কালান, ওর কোনো শরম নেই—সহবত নেই, সারারাত ধরে ওর বিবিকে যে কী সব বলে! আর ওর বিবি—একদম বেশরম···ছিঃ ছিঃ। ওদিকে লেড়কা-লেড়কি কাঁদছে, কিন্তু সব ভুলে ওরা দুজনে···শরম কি বাত!'

ভোলুর কথায় কোনো গুরুত্ব না-দিয়ে গামা আগের মতোই দেশী মদের বোতলে মন দিল। নিরুপায় হয়ে ভোলু চলে গেলে সে বরং ভাঁটিখানার সবাইকে রসিয়ে-রসিয়ে ভোলু রাতে কেন ঘুমুতে পারে না সেই কথা বলতে লাগল। ভাঁটিখানার সবাই ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা বলে হাসতে লাগল। পরে তাদের সঙ্গে ভোলুর দেখা হলে তারাও তাকে নিয়ে মজা করতে লাগল—'আরে ও ভোলুয়া, হামে বাতা না ইয়ার—কালান ওর বিবিকে কী বলে···আর রাতে কী হয় রে···! আরে ইয়ার, তুই তো রাত্ভর মুফত রসিলা বায়স্কোপ দেখতে পাচ্ছিস···' আরও নানা-রকম অশ্লীল কথা বলে তারা ভোলুকে উত্ত্যক্ত করল। নিজেকে ভীষণ পর্যুদস্ত মনে হল ভোলুর।

পরের দিন সে আবার তার ভাইকে ধরল, গামা তখন নেশাসক্ত ছিল না—'তুমি সবার কাছে আমাকে নিয়ে মজাক করেছ···তোমাকে যা বলেছি সব সাচ। ম্যয় ভি ইনসান হুঁ। রাতভর ম্যয় শো নেহি শকতা হুঁ। এই নিয়ে বিশদিন হল আমার নিদ্ নেই··· তুমি জলদি আমার শাদির ইন্তেজাম করো, নেহি তো আল্লা কসম, আমার দিমাগ বিলকুল খারাব হয়ে যাবে। ভাবীর কাছে আমি পাঁচশো রূপাইয়া রেখেছি, শাদির খরচপত্রে অসুবিধা হবে না।'

গোঁফের কোণে মোচড় দিতে-দিতে গামা খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর বলল—'ঠিক হ্যায়, তোর ভাবীর সঙ্গে বাতচিত করি—তোর ভাবীর জানপহ-চানের মধ্যে যদি আচ্ছা লড়কি পাওয়া যায়।'

দেড় মাসের মধ্যেই ভোলুর শাদি ঠিক হয়ে গেল সামাদের মেয়ে আয়েশার সঙ্গে। গামার বিবির খুব পছন্দ হল আয়েশাকে। আয়েশা যেমন দেখতে শুনতে ভালো তেমনি ঘরের কাজকর্মও সব জানে।

জুন মাসে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল। গরমের দিনে শাদি করার ইচ্ছে ছিল না ভোলুর, কিন্তু সবার আগ্রহে শেষ পর্যন্ত তাকে সায় দিতে হল।

শাদির চারদিন আগেই ভোলু তার আর তার বিবির খাটিয়ার চারিদিকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ভালো-ভাবে চটের পরদা টানিয়ে দিল। সে বেশ ভালোভাবে পরদা আটকে দিল যাতে হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে না যায়। খাটিয়ার উপরে সে বিছিয়ে দিল নতুন চাদর, পাঁচিলের উপরে কাছেই নতুন মাটির ঘড়ায় রাখল খাবার পানি, একটি কাঁচের গ্লাসও। খুব যত্নের সঙ্গে এইসব কাজ করল সে।

চারিদিকে-পরদা-টানানো এই শয্যায় শুয়ে ভোলুর অস্বস্তি হতে লাগল। সে খোলা জায়গায় শুতেই অভ্যস্ত, এখন তাকে চারপাশে পরদা টানিয়ে এইভাবে শোবার অভ্যাস করতে হবে। তাই শাদির চারদিন আগে থাকতেই তার মহড়া দিতে শুরু করে সে। এইভাবে শুয়ে বিবির সঙ্গে কিভাবে রাত কাটাবে—সেই কথা ভাবতেই তার সর্ব শরীর ঘামে ভিজে গেল। সেদিনও চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষের ফিশ-ফিশানি, বিচিত্র শব্দ তাকে ঘুমুতে দিল না। সে ভাবতে লাগল—আমরাও কি ওইরকম সব আজীব শব্দ করব? চারপাশের সবাই কি শব্দ শুনতে পাবে না? আর তাদের কি নিদ টুটে যাবে না? যদি কেউ চুপিচুপি পরদায় ফাঁক করে আমাদের বিছানায় উঁকি মারে?

এইসব কথা ভেবে ভোলু আগের চেয়ে আরও বেশি বিভ্রান্ত হয়ে গেল। এই চিন্তা তাকে সব সময়ে তাড়া করে ফিরতে লাগল যে—চটের পরদা কোনো আব্রুই নয়। চারদিকে সব আদমি আওরত রয়েছে। রাতে সবকিছু যখন চুপচাপ তখন ফিশফাশ করে কথা বললেও অন্যের কানে তা পৌঁছে যায়। সে কি এইভাবে বে-আব্রু জীবন কাটাতে পারে? খোলা আশমানের নীচে একই বিস্তারায় আদমি আর আওরত! চারদিকে সবার কৌতূহলী দৃষ্টি এবং কথা শুনতে উন্মুখ কান! রাতের অস্পষ্ট অন্ধকার থাকলেও আশেপাশের লোকেরা প্রায় সব কিছুই দেখতে পায় ···একটু অঙ্গভঙ্গি থেকেই তারা সব কিছু বুঝে নেয়। ···এই চটের পরদা তো বিলকুল বেকার! কালান যখন তার বিবির বুকে হাত দেয় সবাই তা দেখতে পায়। ওই তো তার ভাই গামা শুয়ে আছে, তার সব কিছু প্রায় দেখা যাচ্ছে। ওদিকে মিঠাইওয়ালা ইদুর লেড়কি—তার পুরো পেট দেখা যাচ্ছে পরদার ফাঁক থেকে।

শাদির দিনে ভোলুর পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কোথায় যাবে সে? সে নিজেই তো শাদি করতে চেয়েছিল। এখন সে জালে জড়িয়ে পড়েছে। পালিয়ে গেলে আয়েশার আব্বা সামাদ বেইজ্জত হয়ে খুদকুশি (আত্মহত্যা) করবে। তামাম বেরাদরিতে তাদেরও নাক কাটা যাবে। ঠিক আছে, দেখা যাক—কী হয়। কী আর হবে?—ভোলু ভাবে। আমার অন্য ইয়ার দোস্ত তো এইভাবে দিন কাটাচ্ছে, আমারও আস্তে আস্তে আদত হয়ে যাবে। —এইসব কথা ভেবে সে নিজেকে আশ্বস্ত করে। তারপর শাদি করে আয়েশাকে নিয়ে আসে বাড়িতে।

তাদের কুঠুরি কোলাহল-মুখর হয়ে ওঠে। ভাই-বেরাদর ইয়ার-দোস্ত মুবারকবাদ দিয়ে যায়। দোস্তরা ভোলুর পিছনে লাগে, তাকে নানারকম শলা-পরামর্শও দেয় শাদির পহেলা রাত কিভাবে কাটাবে সে বিষয়ে। সবাইর কথা সে চুপচাপ শুনে যায়।

ছাদে চটের পরদা ঘেরা শয্যায় ভাবী তাদের জন্যে বিছানা পেতে দিয়েছে। বালিশের কাছে চারটি ফুলের মালা রাখা হয়েছে। এক গ্লাস দুধের সঙ্গে এক প্লেট জিলিপিও এনে রেখে দিয়েছে কেউ।

নীচে ঘরের মধ্যে ভোলু সদ্যপরিণীতা বিবিকে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে ছিল। লজ্জানতা আয়েশা মাথা নীচু ক'রে দুপাট্টা দিয়ে মুখ ঢেকে নিজের মধ্যেই সঙ্কুচিত হয়ে বসে ছিল। আবহাওয়া খুবই গরম। ঘামে জ্যাবজেবে হয়ে নতুন কুর্তা ভোলুর গায়ে চেপটে

বসেছে। হাতপাখা নিয়ে সে হাওয়া করছিল। কিন্তু তাতে কিছুই হচ্ছিল না। ভোলু ভেবেছিল—ছাদে না গিয়ে এই ঘরের মধ্যেই রাত কাটাবে। কিন্তু গরম অসহ্য হয়ে উঠলে সে বিবিকে নিয়ে ছাদে উঠে এল।

মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। চারিদিকে কোনো শব্দ নেই। ভোলু নিশ্চিন্ত হল যে এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ তাদের দেখতে পাবে না। নতুন বিবিকে নিয়ে সে চুপিচুপি পরদাঘেরা বিছানায় ঢুকে যাবে এবং কাল ভোরেই আবার সবার অজান্তে নীচে নেমে আসবে।

ভোলু যখন ছাদে পা রেখেছিল তখন চারিদিকে পরিপূর্ণ নিঃশব্দ পরিবেশ, কিন্তু পরদা ঠেলে বিছানায় উঠতে যাবার সময়েই আয়েশার পায়ের ঘুঙুর বেজে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ভোলুর মনে হল—এতক্ষণ যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা সবাই সচকিত হয়ে জেগে উঠেছে। সবাই বিছানায় পাশ ফিরে শুল। চারিদিক থেকে কাশির হাই তোলার শব্দ আসতে লাগল। গরম হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল স্ত্রী-পুরুষের ফিসফিসানি। ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি ভোলু তার বিবির হাত ধরে পরদা-ঢাকা বিছানায় উঠে বসল, ফলে ক্যাঁচ করে আওয়াজ হল। সেই সময়ে অদূরে চাপা হাসির শব্দ তার কানের মধ্যে দামামা বাজাতে লাগল। ভোলুর অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। বিবির সঙ্গে সে কথা বলতে গেলে চারিদিকের ফিশফাশ আওয়াজ আরও উচ্চকিত। কোণে শুরু হল কালামের খাটিয়ার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ, সে শব্দ একটু কমতেই গামার খাটিয়ার শব্দ জোরদার। মিঠাইওয়ালা ইদুর অবিবাহিতা মেয়ে দু-তিনবার উঠে জল খেল। মাটির ঘড়ায় লেগে গ্লাসের ঠুঠুং আওয়াজ ভারি হয়ে ভোলুর কানে ধাক্কা দিল। কশাইখানার খয়রুর ছেলে বারবার শব্দ করে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে বিড়িতে আগুন লাগিয়ে টানতে লাগল।

এই বিবিধ শব্দকল্পদ্রুমের মধ্যে ভোলু তার বিবির সঙ্গে আর কোনো কথাই বলতে পারল না। তার ভয় হল—চারদিকের সব শ্রবণেন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে আছে তাদের প্রতিটি শব্দ শুষে নেবার জন্যে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বিছানায় শক্ত হয়ে সে পড়ে রইল। মাঝে-মাঝে দৃষ্টি ফেলল নতুন-শাদি-করা বিবির দিকে, পাশের বিছানাতেই যে পুঁটুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। আয়েশা খানিকক্ষণ জেগেছিল, পরে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোলু ঘুমোবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার চোখে ঘুম এল না। পর্যায়ক্রমে তার কানে ভেসে আসতে লাগল ফিশ-ফিশানি আর ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ।

শাদির পহেলা রাত সম্বন্ধে তার মনে নানারকম রঙিন সুখের কল্পনা ছিল। বিয়ের আগে সেইসব কথা ভেবে তার শরীর গরম হয়ে উঠত, শিরায়-শিরায় জাগত রক্তোচ্ছ্বাস। কিন্তু এখন সেই সুখময় আনন্দ-কল্পনা সব অদৃশ্য। পহেলা রাতের প্রতি তার মনে আর কোনো আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই। সে বারবার সেই সুখদ আনন্দিত আবহ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু চারদিকের শয্যালীন স্ত্রী-পুরুষের অস্ফুট কথা আর তাদের শয্যার বিচিত্র শব্দ প্রত্যেকবারই তার শরীরে শীতল অনুভূতি সৃষ্টি করছে। তার নিজেকে মনে হচ্ছে নাঙ্গা—একদম উদোম নগ্ন এবং চারিদিক থেকে তার উপরে সবার কৌতূহলী দৃষ্টির শর, কৌতুক-হাস্যের শিলাবৃষ্টি!

ভোর চারটেয় সে উঠে পড়ল। পরদা ঠেলে বাইরে এসে সে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেল। তারপর একটু সময় চিন্তা করল। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ছাদের কোণের দিকে দৃষ্টি গেল ভোলুর। কালামের ছেঁড়া চটের পরদা দুলছিল। ভিতরে সব-কিছুই দেখা যাচ্ছে—কালাম একদম উদোম হয়ে তার বিবির পাশে শুয়ে আছে। ভোলুর শরীর গুলিয়ে উঠল। তার মনে হল—এই ছাদের উপরে কেন এমন হাওয়া বয়ে যায়? আর বয়ে যদি যায়ই তা কেন লোকের পরদা এমনভাবে বে-আব্রু করে দেয়?

ভোলু নীচে নেমে গেল। খানিকক্ষণ পরে অন্য-দিনের মতো কাজে লেগে গেল সে। যেতে-যেতে অনেক জান-পহেচান ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে দেখা হল। তারা তাকে শাদির পহেলা রাতের কথা জিজ্ঞেস করল। দরজি ইয়াসিন দূর থেকে আওয়াজ দিয়ে প্রশ্ন করল—'আরে ভোলু ওস্তাদ, শাদির পহেলা রাত কেমন গুজরালে?' অন্য একজন আবার খুব কাছে এসে বিশ্বস্ত স্বরে আশ্বাস দিল—'যদি কোনোদিক দিয়ে কোনো মুশকিল মেহসুস কর, আমাকে বাতিয়ো। বহুত আচ্ছা ইলাজ বাতলিয়ে দেব।' কেউ কাঁধে জোরে থাপ্পর মেরে চটুলভাবে জিজ্ঞেস করে—'হ্যাঁ ইয়ার, কেমন কুস্তি লড়লে?'

ভোলু কারোর কোনো কথার জবাব দিল না।

সকালে আয়েশা বাপের বাড়িতে চলে গেল। পাঁচ-ছদিন পরে সে ফিরে এলে আবার শুরু হল ভোলুর কঠিন সমস্যা। ছাদে যারা রাতে শুতে যায় তারা যেন ওত পেতে অপেক্ষা করেছিল তার বিবির ফিরে আসার জন্যে। রাতে তারা শুতে গেলে প্রথম দিকে সব চুপচাপ, তারপর সেই ঘটনাবলীর পরপর পুনরাবৃত্তি—সেই ফিশফিশানি, ক্যাঁচক্যাঁচানি, গলা-খাঁকারি, কাশির আওয়াজ, ঘড়ায় লেগে গ্লাসের শব্দ, বিড়ি ধরানো……পাশ ফিরে শোওয়া, চাপা হাসি……

ভোলু চুপচাপ সারারাত তার বিছানায় পড়ে থাকে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। মাঝে-মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আয়েশার দিকে তাকায় এবং বিরক্ত হয়ে ওঠে, ভাবে—আমার কী হল? কেন আমি নিজের মধ্যে কুঁকড়ে যাচ্ছি?

সাত-সাতটি রাত এই একইভাবে কাটল ভোলুর। এর পরে একদম হতাশ আর ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে সে আয়েশাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেলে গামা ভোলুকে জিজ্ঞেস করল—'তুই তো বহোত আজীব আদ্‌মি। আভি-আভি শাদি কিয়া, আর এখনই বিবিকে তার আব্বাজানের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিস! এতদিন হল চলে গেছে, রাতে একেলা কী করে তোর নিদ আসছে?'

ভোলু এক কথায় জবাব দিল—'ঠিক হ্যায়।'

গামা তাকে ছাড়ে না, বলে—'ঠিক কী করে হল? আমাকে সাচ-সাচ বাতা—মামলা ক্যায়া হ্যায়? আয়েশাকে তোর না-পসন্দ?'

'না, তা নয়।'

'আগর তা নয় তো মামলা ক্যায়া হ্যায়?'

ভোলু সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে তার ভাই আবার তাকে সেই একই প্রশ্ন করে। প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে ভোলু ঘর থেকে বার হয়ে গেল। বাইরে একটা খাটিয়া পাতা ছিল, তার উপরে বসে পড়ল সে। ঘরের ভিতর থেকে তার ভাবীর অনুচ্চ, কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে আসছিল। সে গামাকে বোঝাছিল—'তোমার এ-কথা ঠিক নয়, আয়েশা ভোলুর না-পসন্দ নয়।' গামার গলা শোনা গেল—'তব্ মামলা ক্যায়া হ্যায়? বিবির উপরে ওর কোনো টান নেই কেন?'

'টান থাকবে কী করে?'

'কেন?'

উত্তরে ভাবী কী বলল সে কথা স্পষ্টরূপে ভোলুর কানে না এলেও তার মনে হল—তার সমস্ত পৌরুষ-ব্যক্তিত্ব যেন সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণরূপে দলিত মথিত হয়ে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। গামার প্রতিবাদ শোনা গেল—

'নেহি। এ হতেই পারে না। তোকে কে বলেছে?'

'আয়েশা ওর এক সহেলীকে বলেছে, সে-কথা আমার কানে এল।'

এবারে গামার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'বহোত আপসোস কি বাত।'

ভোলুর মনে হল—তার হৃৎপিণ্ডে কেউ যেন ধারালো ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সে তার মানসিক

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। তখনই ছাদে উঠে সে সবার টানানো সমস্ত চটের পরদা টেনে-টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। ছিঁড়ে ফেলার শব্দ শুনে সবাই দৌড়ে ছাদে গেল। ভোলুর কাজে বাধা দিতে গেলে সে তাদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করল। সমস্ত ব্যাপারটা খুবই বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল। বাঁশের একটি টুকরো নিয়ে ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত কালান ভোলুর মাথায় বসিয়ে দিল। দু চোখে অন্ধকার দেখে সেখানে সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল ভোলু। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন তার মাথা একদম বিগড়ে গেছে।

ভোলু এখন একদম নগ্ন হয়ে শহরের রাস্তায়, বাজারের পথে ঘুরে বেড়ায়। যেতে-যেতে যখনই কোথাও চটের পরদা ঝুলতে দেখে দৌড়ে গিয়ে কুটিকুটি করে তা ছিঁড়ে ফেলে সে।

*

উর্দু সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ কথাকার সাদাত হাসান মনটোর জন্ম ১৯১২ সালের ১২ মে পানজাবের হোশিয়ারপুর জেলার সামরালের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। মূলত তাঁরা ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। অমৃতসর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আলিগড় মুসলিম য়ুনিভার্সিটিতে ইনটার-সায়ান্সে ভরতি হন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষালাভ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। আলিগড় থেকে দিল্লীতে এসে গল্পলেখার সঙ্গে-সঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদনা শুরু করেন তিনি। অল ইনডিয়া রেডিয়োতে বহু সফল এবং আকর্ষণীয় নাটক লেখবার পরে বম্বে চলে যান। সেখানে কিছুদিন পত্রিকা-সম্পাদনা করেন, কয়েকটি ফিল্মের কাহিনীও লেখেন। বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে মনটো তিনশো ছোটোগল্প, শতাধিক রেডিয়ো-নাটক-ফিচার, স্মৃতিচারণা এবং একটি উপন্যাস লিখেছেন।

দেশ-বিভাগের পরে তিনি বম্বে থেকে লাহোরে চলে যান। অশ্লীলতার দায়ে ব্রিটিশ-ভারতে তিনবার এবং পাকিস্তানে চলে যাবার পরে আরও তিনবার তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা হয়। প্রতিবারেই তিনি মুক্তি পান। প্রগতি আন্দোলনের প্রভাব তাঁর রচনায় রূপায়িত হলেও প্রগতিবাদীরা তাঁকে তাড়না করেছেন। প্রাচীন-পন্থীরা তাঁকে চিহ্নিত করেছেন অশ্লীল লোক বলে, আধুনিকেরা লাল কমিউনিস্ট। চারিদিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে মনটোকে একবার আশ্রয় নিতে হয়েছিল লাহোরের উন্মাদাগারে।

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ১৮ই জানুয়ারি হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

অসীম মুখোপাধ্যায়

আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব, সাধারণ্যের প্রজ্ঞায় যা অপ্রতীত, লোকধর্মের সাধনে যা সহজে দৃশ্যমান নয়, অথবা সাম্প্রতিক সমাজে তো নয়ই—দুই কালান্তর-ধর্মী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব দুই ভিন্ন মেরুর গ্রন্থিবন্ধনের মাধ্যমে নিজ-নিজ উপকার সাধন ছাড়াও দেশ আর সমাজের শ্রীবৃদ্ধিকে সম্ভবপর করে তুলতে পেরেছিলেন। এঁরা হলেন জগদীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। এঁদের বন্ধুত্ব বা সম্পর্কের একটি আরম্ভ, মধ্য এবং অন্ত ছিল। বিশ্লেষণ করলে তার থেকে যেন একটি কাহিনী গড়ে ওঠে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে ভারতবাসী প্রথম যে ব্যক্তিত্বটিকে চিনেছিল, তিনি জগদীশচন্দ্র বসু। তিনিই প্রথম ভারতীয় বৈজ্ঞানিক, যিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে আর জাতীয় ভিত্তিতে এদেশে মৌলিক গবেষণার কাজ শুরু করেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর মৌলিক বিজ্ঞান-অনুশীলন শুরু করেন, তখন বিজ্ঞানচর্চা সবেমাত্র এদেশে পা রেখেছে। শিক্ষাক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও ভারতবর্ষের সেই বিজ্ঞানচর্চায় মৌলিক বিজ্ঞান-অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা একেবারেই ছিল না বললে সঠিক বলা হয়। এর কতগুলি কারণ ছিল। প্রথমত, মুক্ত মন নিয়ে ইউরোপের রেনেসাঁর জন্মদাতা বিজ্ঞান-নামক বিষয়টিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা তৎকালীন ভারতবর্ষের পক্ষে কঠিনতম একটি কৃতি। দ্বিতীয়ত, সহস্র বছরের সংস্কারে নিবদ্ধ সমাজব্যবস্থা নির্মম পাদপীঠে তখন বিজ্ঞান যূপকাষ্ঠে নিবেদিত সদ্যোজাত বলির পশুর মতো ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জগদীশচন্দ্র বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিকের সম্পূর্ণ ডিগ্রি লাভ করে সেই যুগসন্ধিক্ষণেই দেশে ফিরে আসেন বিজ্ঞানের উপর মৌলিক গবেষণার উদ্দেশ্য নিয়ে। গবেষণা যে আদতে কী, কোথায় তার উপকারিতা, বা কতখানিই তার প্রয়োজন—সেই মূল্যমান এদেশে নির্ধারিত হতে তখনও বহু দেরি। বস্তুত "গবেষণা" শব্দটিই তখন এদেশে একটি নতুন শব্দ। জগদীশচন্দ্র যে সেই

অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং একটি নিদারুণ কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যে তাঁকে সেই সময় গবেষণাকার্য চালাতে হয় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব উক্তির মধ্যে, 'When I began my work at the Presidency College, there was no laboratory and no instrument makers. Everyone said that original scientific work was impossible in India.'[১]

পরাধীন দেশের একজন নাগরিক হিসাবেও জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চা ব্যাহত হয়েছিল। কারণ তৎকালীন বিদেশী শাসকরা বদ্ধমূল হয়ে এ ধারণা পোষণ করতেন যে, 'ভারতবাসীরা কেবলই ভাবপ্রবণ আর স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনদিনই তাহাদের নয়'।[২] কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মনে ছিল দৃঢ়তা এবং অবশ্যই তা সাধারণের সীমার অনেক ওপরে ছিল বলেই সেই অনন্যসাধারণ মানুষটি তাঁর দৃঢ়তা এবং নিরলস পরিশ্রমকে একত্রে মিলিয়ে এইসব বাধাকে পাশ কাটিয়ে যান। কিন্তু এর পরে আবার যখন তিনি গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তখন একটি বিরাট আর কঠিন বাধা আসে তাঁর স্বক্ষেত্র থেকেই। প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিচালকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে জগদীশচন্দ্র নাকি কলেজের বিজ্ঞানাগারটিকে নিজের ব্যক্তিগত বিজ্ঞান-চর্চার স্বার্থে ব্যবহার করছেন। তাঁর এইরকম ব্যক্তিগত স্বার্থে (?) বিজ্ঞানাগার ব্যবহার রুখতে অতএব বদলে দেওয়া হল তাঁর কলেজ রুটিন। ১৯০৩ সালের ১৮ই এপ্রিল রুটিনের ক্রমবর্ধমান চাপের কথা রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষের হীন কার্যকলাপের এবং সন্দেহাকুল মানসিকতার স্পষ্ট ছবিটি প্রতীয়মান: 'The college-routine was made as arduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation.'[৩]

জগদীশচন্দ্র যে সত্যিই সদর্থে পৃথিবীর বিপরীতে বাস করছিলেন তার আরো একটি অকাট্য প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের লেখায় ছড়িয়ে আছে, 'প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরেরা মিলে অমৃতের জন্য যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি'।[৪] এই সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জগদীশচন্দ্রের সুগভীর এবং নিজস্ব পন্থায় অগ্রসরণের মানসিকতা তাঁকে শুধু বিজ্ঞানের গবেষণায় স্থির রেখেছিল তাই নয়, তিনি উত্তরকালে যথোচিত সাফল্য লাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনের এই সংগ্রামমুখর অধ্যায়ে একাধিক উদারচেতা, বিদগ্ধ ব্যক্তির সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেন, যা তাঁর ক্রমিক উত্তরণের পথকে প্রশস্ত করে। উল্লেখ্য নামগুলি হল ভগিনী নিবেদিতা, ওলিবুল, রমেশচন্দ্র দত্ত, এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংঘাতমুখর পরিবেশের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রচার আর আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিবেদিতা যেভাবে সাহায্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়, 'এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রী রূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।'[৫] নিবেদিতার এই উৎসাহদানের পাশাপাশি জগদীশচন্দ্রের উত্তরণের অন্য যে মানুষটি অন্তরালে থেকেও গুরু দায়িত্ব পালন করেন, তিনি কিন্তু জগদীশচন্দ্রের অকৃত্রিম বন্ধু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বভাবতই প্রশ্ন এসে পড়ে: জীবনের দুই ভিন্ন বৃত্তপথের পথিক—এক কবি আর নীরস বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই সৌহার্দ্যের সূচনা কোথায় বা কবে? জগদীশচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের এই সৌহৃদ্যের সূচনা-কালের কোনো নির্দিষ্ট চিহ্ন তাঁদের চিঠিপত্রের মধ্যে না থাকলেও সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ

করলে আপাতভাবে ১৮৯৭ সালের এপ্রিলে জগদীশচন্দ্র ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে আসার পর বিজয়ী বৈজ্ঞানিককে অভিনন্দন জানাতে জগদীশচন্দ্রের তৎকালীন আবাসস্থল ১৩৯, ধর্মতলা স্ট্রীটে যাওয়াটাকেই প্রথম যোগাযোগ বলে মনে হয়।[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ধর্মতলা স্ট্রীটের এই বাড়িটি ছিল বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী আনন্দমোহন বসুর। জগদীশচন্দ্রের বড়দিদি স্বর্ণপ্রভা দেবীকে বিবাহের সূত্রে আনন্দমোহন জগদীশচন্দ্রকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কিন্তু ওইদিন গেলেও জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয় নি রবীন্দ্রনাথের, দেখা না হলেও বয়সের হিসাবে তিন বৎসরের বড়ো বৈজ্ঞানিকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের টেবিলের উপর একটি ম্যাগনোলিয়া ফুল রেখে যান।[৭] সম্ভবত সেই পরিচয়ের সূত্রপাত।[৮] ১৮৯৭ সালেই যে উভয়ের বন্ধুত্বের সূচনা হয়, তার আভাস মেলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে ১৯০০ সালের ২রা নভেম্বর লনডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়। এই চিঠির এক জায়গায় জগদীশচন্দ্র লেখেন, 'তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তারপর একটি-একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম।'[৯] জগদীশচন্দ্রের লেখা উপরোক্ত চিঠি ছাড়াও, জগদীশচন্দ্রের প্রথম বৈজ্ঞানিক মিশনের সফলতায় অভিনন্দন জানিয়ে, 'জগদীশচন্দ্র বসু' ('বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে') শিরোনামায় একটি কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে "প্রদীপ" পত্রিকাটিতে 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি'—এই নামে কবিতাটি ছাপা হয়। রচনা-শেষে কবিতাটির তারিখ ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪ (১৯শে জুলাই, ১৮৯৭) উল্লেখ রয়েছে।[১০] সমসাময়িক সময়ের একজন প্রসিদ্ধ লেখক জগদানন্দ রায়ের লেখনীর মধ্যে দিয়েও এই সত্য পুনরায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—'১৮৯০ সালের এপ্রিল মাসে বসু মহাশয় ভারতে প্রত্যাগত হন।'[১১]

সূত্রপাতপর্বে মধ্যবর্তী সেতু ছিল একটি ম্যাগনোলিয়া ফুল। পরবর্তী কালে জীবনযাপনের নিয়ত তাগিদ যে বন্ধুত্বকে দৃঢ়তর করেছে,—'পরস্পরের দেখা হোক না হোক, তাঁরা কাছাকাছি থাকুন, বা না থাকুন মধ্যবর্তী ম্যাগনোলিয়া ফুলটির বর্ণগন্ধ ম্লান হয় নি।'[১২] কার্যব্যপদেশে উভয় বন্ধুকেই দূরে-দূরে থাকতে হয়েছে, কিন্তু সময়ের চড়াই-উতরাই ঠেলে বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হয়েছে, আন্তরিক হয়েছে। এই সত্যটি ছড়িয়ে আছে তাঁদের পারস্পরিক চিঠিপত্রের মধ্যে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন মনে দেখা দেয় তা হল, তাঁদের এই পারস্পরিক চিঠিপত্র লেখার সূচনা হয় কবে? তারিখ আর সনের হিসাবে ১৮৯৯ সালের ২৬শে মে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জগদীশচন্দ্রকে চিঠি লেখেন। অপর পক্ষে ১৮৯৯-এর ২৫শে এপ্রিল জগদীশচন্দ্র লেখেন রবীন্দ্রনাথকে। বিস্ময় আর কৌতুক ছড়িয়ে রয়েছে পত্রশেষের পাঠে। দুটি মানুষ অন্তরের টানে আপন হয়ে উঠেছেন সেখানে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম চিঠির পত্রশেষে লেখেন, 'আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' অথচ ঠিক চারটি চিঠি পেরিয়ে পঞ্চম চিঠিতে সেই পত্রশেষের পাঠ বদলিয়ে গিয়ে হয়, 'আপনার চিরন্তন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। অন্যদিকে পত্রপ্রথমে এতদিনের প্রিয়বরেষু বা প্রিয় 'বন্ধুর' জায়গায় তিনি জগদীশচন্দ্রকে সম্বোধন করেন 'বন্ধু' হিসাবে। পরবর্তী প্রত্যেক চিঠিতেই ওই প্রথম পাঠ 'বন্ধু' বজায় থেকেছে। কিন্তু পত্রশেষের পাঠ ষষ্ঠ চিঠিতে, 'তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (২৩শে নভেম্বর ১৯০০), সপ্তম চিঠিতে, 'তোমার শ্রীরবীন্দ্রনাথ' (১২ ডিসেম্বর ১৯০০) এবং অষ্টম চিঠিতে এসে সেই পত্রশেষের পাঠ বদলিয়ে গিয়ে হয়,—'তোমার রবি'। কবি আন্তরিক হলেন। পত্রশেষের তাঁর এই 'তোমার রবি'র পাঠ জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত বজায় ছিল। অপরদিকে, ১৯০০ সালের ২রা নভেম্বর থেকেই,—'আপনার জগদীশচন্দ্রের' পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক লেখেন, 'তোমার

জগদীশ'। পত্রশেষ-সম্বোধনের এই আন্তরিকতার পরিবর্তন উভয়ের বন্ধুত্বের ক্রমিক গভীরতাকেই স্পষ্ট করে তোলে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের পর গতানুগতিক অধ্যাপনার মধ্যে নিজস্ব চিন্তা এবং কর্মপ্রয়াসকে সীমাবদ্ধ না রেখে জগদীশচন্দ্র যে মৌলিক বিজ্ঞান অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, প্রাথমিক নানা বাধা-বিপত্তি পার হয়ে তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের বাথরুমের পাশে একটি ছোটোঘরে তাঁর পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। দেশীয় মিস্ত্রির সাহায্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে তিনি প্রায় অসাধ্যসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর উদ্যোগে বাধ সাধল কলেজ কর্তৃপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা আর তদনুরূপ ব্যবহার। কর্তৃপক্ষের হীন কার্যকলাপ ব্যথিত, হতাশ করে তোলে জগদীশচন্দ্রকে। জগদীশচন্দ্রের এই মানসিক হতাশার খবর বন্ধু হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। বৈজ্ঞানিক বন্ধুটি যাতে এই মানসিক অবসাদ কাটিয়ে উঠে স্বাধীনভাবে নিজের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন, তার জন্য রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের এই সচেষ্টতার পরিচয় মেলে তাঁর বন্ধু ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মার নামে জনৈক ব্যক্তিকে লেখা চিঠিতে, 'রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নয়। রবিবাবু ইহাতে মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন, বিশেষত বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ১০,০০০ হাজার টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুরারাজদরবারে ভিক্ষা করতে উপস্থিত হইবেন।'[১৩] এইভাবে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে অর্থ-সংগ্রহের সূত্রপাত হয়।

১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ পান জগদীশচন্দ্র। হাজারো প্রশাসনিক ঝামেলা পেরিয়ে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদানের সরকারি অনুমতি আদায় করার পর জগদীশচন্দ্র আর তাঁর সহধর্মিণী অবলা বসু ইউরোপ-যাত্রার তোড়জোড় শুরু করেন। কিন্তু এ যাত্রার প্রাক্‌কালে এসে উপস্থিত হয় পাথেয় সংগ্রহের সমস্যা। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—'এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয় নি, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পুরো ভাঁটা।...অগত্যা সে দুঃসময়ে আমার একজন বন্ধুর শরণ নিতে হোল। তিনি ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেব মাণিক্য।'[১৪] বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সহায়হীন জগদীশচন্দ্র যাতে সেই অর্থের সমস্যায় না পড়েন তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করতে রবীন্দ্রনাথ সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। কবির এই উদ্যোগ আর আন্তরিক প্রচেষ্টার পরিচয় মেলে ১৩০৮ সালে ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লেখা একটি চিঠিতে, 'জগদীশবাবুর কার্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না—লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত, ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব। ...সুতরাং ভিক্ষুকভাবেই আমি এবার অসঙ্কোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব।'[১৫] বন্ধুর বিজ্ঞানচর্চায় সাহায্য করাকে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দায়িত্ব বলে মনে করতেন, তাই নিজের অখণ্ড ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করেও অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি আগরতলায় ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। কবির ধারাবাহিক অনুরোধ এবং উৎসাহে উৎসাহী হয়ে এবং জগদীশচন্দ্রের প্রয়োজন অনুভব করে ত্রিপুরার মহারাজ মাঝে-মাঝেই জগদীশচন্দ্রকে যে অর্থ সাহায্য করতেন সেই তথ্যের

সত্যতা আগরতলা থেকে প্রবাসী জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে পাওয়া যায়। চিঠিটি ১৩০৮ সালের নভেমবর মাসে লেখা। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—'তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। ...এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।'[১৬]

একজন কবি আর সাহিত্যিক হয়ে স্বদেশের মঙ্গলের জন্যেই কলম ধরে রবীন্দ্রনাথকে যে বহুতর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল স্বদেশবাসীর কাছ থেকেই, সেই অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করে এবং বাকিটা পরাধীন ভারতবর্ষের চতুর্দিকের অবস্থা পর্যালোচনা করে, রবীন্দ্রনাথ এই বাস্তব সত্যটুকু উপলব্ধি করেন যে, ভারতবর্ষ আর যাই হোক, উন্নততর বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রশস্ত নয়। সেই কারণেই জগদীশচন্দ্রের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছাকে বাধা দিয়ে তিনি বারবার জগদীশচন্দ্রকে ভারতে ফিরে না আসার অনুরোধ করেন। কিন্তু বিদেশে দীর্ঘ দিন থাকার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের প্রধান অসুবিধা ছিল অর্থের। জগদীশচন্দ্রের এই অসুবিধা দূর করতেও যে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন তা ১৯০১ সালের ৪ঠা জুন জগদীশচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠির মধ্যে দিয়েপ্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে কবি লেখেন, 'অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ করো। দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা অপহরণ করিয়া সেতু বাঁধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।'[১৭] এইভাবে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করেছেন।

জগদীশচন্দ্র যে তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন, সেই উদ্ভিদের প্রাণতত্ত্বকে ইংরেজ জীববিজ্ঞানীদের একাংশ প্রথম দিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন। ফলত, ভারতবর্ষেও সেই অস্বীকারের প্রভাব এসে পড়ে। সহজে এ বিশ্বাস উৎপাদন করা শক্ত হয়ে পড়ে যে সত্যিই উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন আছে। এই পরিস্থিতিতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত তথ্যের বৈজ্ঞানিক সফলতা এবং প্রচারের দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজের কাঁধে তুলে নেন। সে সময়ে কাজটি সত্যিই কঠিন ছিল। আজকের ধ্যান-ধারণা বা সুযোগ-সুবিধে কোনোটাই সে সময়ে ছিল না। কিন্তু প্রচারের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা যায় না। কারণ প্রচার না হলে মানুষের অজ্ঞাতেই থেকে যেত এ যুগান্তকারী আবিষ্কার। "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুর বিজ্ঞানসাধনার বিবরণ বাঙালি পাঠকসমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে "আচার্য জগদীশের জয়বার্তা" ("বঙ্গদর্শন", আষাঢ়, ১৩০৮) ও "জড় কি সজীব"? ("বঙ্গদর্শন", শ্রাবণ, ১৩০৮) নামক দুটি প্রবন্ধ লেখেন। "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এ দুটি প্রবন্ধ জগদীশচন্দ্রকে যে কতখানি উৎসাহিত করে তার পরিচয় মেলে ১৯০১ সালের ২৫শে জুলাই রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে,—'তুমি যে গত মাসে আমার কার্যের আভাস বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।...আমি অনেক সময় মনে করিয়াছি যে, বাঙ্গলা কোনো মাসিক পত্রে আমার এই নূতন কার্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব। কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়া সে ইচ্ছা মনেই রহিয়াছে। যদি তুমি সেগুলি কোনো-দিন প্রস্ফুটিত করিতে পার, তাহা হইলে সুখী হইব।'[১৮] জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তাপ্রচারে তিনি নিজেই কেবল কলম ধরেন নি, বন্ধু ও আত্মীয়মণ্ডলীকেও তিনি এই কাজে প্রণোদিত করেন। এই সময় তাঁর সহকর্মী জগদানন্দ রায় ধারাবাহিকভাবে জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেন।'[১৯] রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় "ভারতী" পত্রে "বিলাতে অধ্যাপক বসু" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সুহৃদ্ রামেন্দ্র-

সুন্দর ত্রিবেদী "অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার" (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩০৮) ও "অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার" ("সাহিত্যপত্র", ভাদ্র, ১৩০৮) নামক দুটি প্রবন্ধ লেখেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের গবেষণাপথের সমস্ত বাধাবিপত্তিকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য বদ্ধমূল ছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের কর্মধারায় এবং উত্তরণের পথে রবীন্দ্রনাথের যেমন সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বান্তঃকরণ সাহায্য ছিল, তেমনি পাশাপাশি কবির জীবনে এই বৈজ্ঞানিক বন্ধুটির প্রভাবও কম ছিল না। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের সূচনাকালে কবি হিসাবে দেশ-জোড়া খ্যাতি, প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু সেই কবিব্যক্তিটির স্বক্ষেত্রের গভীরতাকে চিনে নিয়ে বা বলা যায় স্বর্ণখনির অন্ধকারে পরিচয়ের দীপটি জ্বালিয়ে, সেই খনির ঋদ্ধিকে ঠিকই চিনে নিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। বন্ধুর এই প্রতিভা যাতে সঠিকভাবে স্ফূর্ত হয়, স্বদেশের চিহ্নিত গণ্ডি পেরিয়ে যাতে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় স্থান পেতে পারে, তার জন্য জগদীশচন্দ্রের চেষ্টার অন্ত ছিল না। ১৯০০ সালের ২রা নভেম্বর লনডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠির মধ্যে দিয়ে জগদীশচন্দ্রের এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়: '...তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। ...তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহলে কতক বুঝিতে পারিবে।'[২০] সেই একই মাসের ২৩শে নভেমবর জগদীশচন্দ্র পুনরায় লেখেন, 'তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। ...এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলে যথেষ্ট মনে করিব।' পাশ্চাত্য দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনাপ্রচারের উদ্যোগ হিসাবেই জগদীশ-চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা "কাবুলিওয়ালা" নামক গল্পটি ইংরাজিতে তরজমা করে "Harpes" ম্যাগাজিনে জমা দেন।[২১] কিন্তু সে সময়ের পাশ্চাত্যবাসীরা প্রাচ্য দেশের জীবন সম্বন্ধে ততখানি উৎসাহিত না হওয়ায় বৈজ্ঞানিকের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জগদীশচন্দ্র একেবারে নীরস বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তাঁর মনের এক মেরুতে বিজ্ঞানের যেমন অধিকার ছিল, তেমনি অন্য মেরুতে সম মর্যাদায় ছিল সাহিত্যের অধিবাস। সাহিত্যের অধিবাস অর্থে সাহিত্যপ্রীতিই শুধু নয়, ঝোঁক ছিল সাহিত্যরচনার দিকেও। এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ সমকালীন বিভিন্ন মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি। এ ছাড়াও ১৩২৪ সালে "অব্যক্ত" নামে স্বরচিত একটি গ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেন। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অবদান হয়তো পরিমিত, কিন্তু তা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং মূল্যবান। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এবং তাঁর উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের এই সাহিত্যপ্রীতি অবশ্যই একটি অনু-ঘটকের কাজ করেছে। জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার Petrick Geddes বক্তব্যে যেমন প্রমাণ মেলে তেমনি আরো পরিচ্ছন্ন প্রমাণ মেলে তাঁদের পারস্পরিক চিঠিপত্রে। এই প্রসঙ্গে প্যাট্রিক গেডিস লেখেন, 'রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে বাসকালে জগদীশচন্দ্র যখন তাঁহার সন্দর্শনে যাইতেন তখন এই 'কড়ার' থাকিত যে, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ একটি গল্প রচনা করিয়া জগদীশ-চন্দ্রের চিত্তবিনোদন করিবেন।'[২২] ১৯০০ সালের ১৮ই এপ্রিলে লেখা জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠিতে দেখা যায় যে, তিনি শিলাইদহ থেকে ফিরে তাঁর 'পাওনা' আদায়ের চেষ্টা করছেন,—'আপনার লেখা গল্প মাঝে-মাঝে পাঠাইবেন। প্রথম কয়েকটা দিন আপনি ফাঁকি দিয়াছেন। অন্তত সে কয়টা গল্প আমার 'পাওনা' আছে।'[২৩]

পৌরাণিক-কাহিনী-নির্ভর কবিতা রচনাতেও জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বারে-বারে উদ্বুদ্ধ করেন। জগদীশচন্দ্রের তাড়াতেই রবীন্দ্রনাথ "কথা ও কাহিনী" লেখেন। এক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের ধারাবাহিক উৎসাহের স্বীকৃতি হিসাবে "কথা" কাব্যগ্রন্থ জগদীশচন্দ্রকে

উৎসর্গ করেন কবি। আশৈশব মহাভারতের কর্ণ-চরিত্রটি জগদীশচন্দ্রকে আকর্ষণ করত। ১৮৯৯-এর ২০শে মে তাঁর কর্ণ চরিত্রের প্রতি অনুরক্তি কবিকে লেখা একটি চিঠিতে অনুরোধ হয়ে ফুটে ওঠে—'একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষ-গুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়।'[২৪] সে বছরেই অনুরোধ রক্ষিত হল। সাহিত্যের ভোজে ইতরজনেরা অর্থাৎ আমরা পেলাম "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ"। "কাহিনী" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই কাব্য-নাট্যটি এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক রচনা বলে স্বীকৃত। এই-ভাবে নিজস্ব 'পাওনা' আদায়ের মধ্যে দিয়ে জগদীশ-চন্দ্র বাঙলা সাহিত্যকে নিত্যনতুন সম্ভারে সাজিয়ে তোলার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছেন ধারাবাহিকভাবে।

আপাত অর্থে বিজ্ঞান এবং সাহিত্য পৃথক। কিন্তু সে পার্থক্য কেবল যাত্রাপথ, পাথেয় আর উপলব্ধির প্রকাশভঙ্গিতে। কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্রে এগুলি একই বোধসঙ্ঘাত—তা হল জিজ্ঞাসা। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র যেমন সাহিত্যের একটি মস্ত ক্ষেত্র নিজের মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি কবি রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও বিজ্ঞানের জন্য অনুসন্ধিৎসা কম ছিল না। বলা যায়, তাঁর ছিল তীব্র আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের এই স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা জগদীশচন্দ্রের অজানা ছিল না। বিজ্ঞানের আশ্চর্য অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানার প্রতি কবির শিশুর মতো কৌতূহল দেখে জগদীশচন্দ্র বন্ধুর সেই জাগ্রত কৌতূহল মেটাবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা গবেষক জগদীশচন্দ্রের চিঠির একটা বড়ো অংশে ঠাঁই পেত বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্যসমূহ। তাঁর নিজের গবেষণার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় যেমন তিনি জানাতেন, তেমনি থাকত আধুনিক বিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কারের বর্ণনা।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানপিপাসু চিত্ত এই চিঠিগুলি থেকে তাঁর মনের খাদ্য আহরণ করত। এরাই প্রভাব ফেলেছিল কবির বিজ্ঞানবিষয়ক কিছু রচনাতেও। প্রসঙ্গত বলা যায়, "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় কবির রচিত নিবন্ধ। "জড় কি সজীব?" —এর নাম। পাশ্চাত্যে সমকালীন বিজ্ঞানের নূতন-নূতন পদক্ষেপগুলির সঙ্গে কবির পরিচয় দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ইংলনড থেকে জগদীশচন্দ্র নিয়মিত *Electrician* নামক পত্রিকাটি পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথকে।[২৫] পত্রিকাটি বহন করত তৎকালীন পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতির খবরাখবর। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বদেশের বিজ্ঞানচর্চা তখন ভালো করে শৈশবেও পৌঁছায় নি। স্বভাবতই জগদীশচন্দ্র প্রেরিত *Electrician* পত্রিকাটি বিশ্বের আঙিনায় বিজ্ঞানের সঙ্গে কবির পরিচয় নিবিড় করে রাখত।

যে-কোনো সৃজনশীল ব্যক্তিরই মানসিক টানা-পোড়নে ভোগেন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই মানসিক সমস্যার কোনো অভাব ছিল না। স্বদেশ, বিদেশ—যেখানে যখনই কোনোরকম মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন জগদীশচন্দ্র, তখনই তার সমাধানকল্পে কবির ধারাবাহিক চিঠি পৌঁছেছে তাঁর ঠিকানায়। ইংলনডের এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কৃত তত্ত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। সেই শিক্ষিত ইউরোপীয়দের ধারাবাহিক সমালোচনা আর কদর্য ব্যবহার যখন জগদীশচন্দ্রকে মানসিক-ভাবে পীড়িত করে তুলেছে, আপন সাফল্য সম্বন্ধে যখন তাঁর নিজের মনে জেগে উঠেছে সন্দেহ, তখন তাঁকে নিত্যনতুন প্রেরণায় উৎসাহিত, উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিলম্বিত হতে পারে, তবে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী—এই একই বাণী বারবার কবির চিঠিতে ঋজু হয়ে ফুটে উঠেছে। তুলনীয়ভাবে এসেছে রোমক সম্রাট সীজারের কীর্তির উল্লেখ,—'সীজারের নৌকা কখনও ডুবে না।' ওই একই চিঠিতে (সন ১৯৩২, মে) অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন,

'ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়তালিকা অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।' 'ভারত-বর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে।' ব্যক্তিগত অসাফল্য যাতে জগদীশচন্দ্রকে ছুঁতে না পারে তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভারতবর্ষের আধুনিক বিজ্ঞানসাধনার অগ্রদূত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ভারতের বিজ্ঞানসাফল্য যে সম্পূর্ণভাবে জগদীশচন্দ্রের উপর নির্ভর করছে এবং সমগ্র দেশবাসী সাগ্রহে তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে—এই ধারণা তিনি জগদীশচন্দ্রের মনে গড়ে দেন। ব্যাপারটা খুব সোজা নয়—ব্যক্তি থেকে জাতি, ধারণাগত এই বিরাট পরিবর্তন ও বিস্তার জগদীশচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। তিনি স্বক্ষেত্রে দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রবর্তী হন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে জগদীশচন্দ্র নিয়মিত-ভাবে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ চেয়েছেন। একটি বিরাট কর্মসাধনার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা বা সংশয় এসে যাতে বাধার প্রাকার না গড়ে তুলতে পারে, তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও কলম ধরেছেন। ১৯২১ সালের শুরা মে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠির মধ্যে দিয়ে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে…' 'তোমার নিকট পরামর্শ চাই, অন্তত আরো ৫ বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে এই কার্য কোনো রূপে সমাধা হইতে পারে, দেশে ফিরিলে (যতদূর বুঝিতে পারিতেছি) সব কার্যের বিরাম। এদেশে আর কিছুকাল থাকিব কি;'[২৬] এই চিঠির উত্তরে পরামর্শ হিসেবে ১৯৩১ সালের ২১শে মে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, '…যদি ৫, ৬ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্য প্রস্তুত হোয়ো। …যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখান থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।'[২৭] সংগ্রাম-মুখর সেই বিলাতপ্রবাসী বৈজ্ঞানিকের জীবনে কবির চিঠি নূতন করে উৎসাহ জোগাত, দূর করে দিত সংশয় বা দ্বিধা। তাঁর নিজেরই উক্তিতে রয়েছে সেই দ্বিধামুক্তির ছায়া,… 'তুমি জান না তোমার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ আশ্বস্ত হই,…উৎসাহ কিংবা অবসাদের সময়ে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। অধিকাংশ সময়েই তো অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়।'[২৮]

সমস্ত জীবনে তো রবীন্দ্রনাথকে কম মৃত্যু, বিয়োগব্যথা ভোগ করতে হয় নি। মর্মান্তিক প্রিয়-বিচ্ছেদ যখন তাঁর মনের উপর একটা যন্ত্রণার আবরণ নির্মাণ করত, তখনও তিনি আশ্রয় নিতেন এই বসু-দম্পতির কাছে, বিশেষ তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু জগদীশের কাছে। ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য সবসময় কাছে পৌঁছানো হয়তো সম্ভব হত না। সংযোগের সেতু তখন রক্ষা করত চিঠিগুলি। বিভিন্ন সময়ে বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে কবি নিজেকে অনেক স্বচ্ছন্দ করে তুলে ধরেছেন। কামনা করেছেন জগদীশচন্দ্রের উত্তপ্ত সান্নিধ্য। জগদীশচন্দ্রকে লেখা বিভিন্ন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সাংসারিক সমস্ত রকম দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে একটু বিশ্রামের জন্য তাঁর কাছে চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৯০১ সালের ২১শে মে, জগদীশচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়। এই চিঠির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'আমার ভারি ইচ্ছা করচে আমরা জন দুই তিন মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই-তিনের জন্য জমিয়ে বসি।'[২৯] ১৯০১ সালের ১৭ই সেপটেমবর জগদীশচন্দ্রকে লেখা আর-একটি চিঠিতে তিনি লেখেন,—'তোমার সার্কুলার রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্বদাই মনে পড়ে।'[৩০] ধারাবাহিক কর্ম-ব্যস্ততার অবসরে কবি মাঝে-মাঝেই জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে দীর্ঘ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে কেদারা টেনে বসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। ১৯১৩ সালে লনডন থেকে জগদীশচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে ক্লান্ত কবি আশ্রয় চেয়েছেন জগদীশচন্দ্রের কাছে এই ভাষায়,

—'এই খ্যাতি প্রতিপত্তির ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মন টিকিতেছে না। একটুখানি নিভৃতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি।'[৩১]

১৯০২ সালের মে মাসে শিলাইদহ থেকে জগদীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশ,—'তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি। আর কোনো পথ ভারতবর্ষের পথ নহে —তপস্যার পথ,…আমরা বিশ্বকে অনেক জিনিস দান করিয়াছি কিন্তু সে কথা কাহারও মনে নাই। আর একবার আমাদের গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে। না হইলে মাথা তুলিবার আর কোন উপায় নাই।'[৩২] সৃজনের ধর্মই হল অনুসন্ধান আর অনুসন্ধানীর ধর্ম হল মেলবন্ধন ঘটানো। ভারতবর্ষ যদি তার ফেলে-আসা জ্ঞানচর্চার পথে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হয়ে থাকে, তবে এ-দুটি মানুষের নাম ইতিহাস স্বীকার করবে। স্বীকার করবে তাঁদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় সম্পর্ককেও। দুইটি মানুষ ভিন্ন দিগদর্শনের অথচ দুটি মানুষ শেষাবধি সেই প্রভায় ভাস্কর, পরস্পরের কাছে চিরন্তন ধী, চিরন্তন ঋদ্ধি। চিরন্তন অগ্রগমনের শেষ শব্দটি মনে পড়ায়—'বন্ধুত্ব' যার নাম।

সহায়ক গ্রন্থ

১. J. C Bose Speaks—edited by Dibakar Sen and Ajoy Kumar Chakraborty, Calcutta, 1985, p 39

২. "অব্যক্ত"—জগদীশচন্দ্র বসু, কলিকাতা, ১৩২৮, পৃ ১১০-১১১

৩. "চিঠিপত্র", ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ ১৪৭-১৫৩

৪. পত্রপরিচয়, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

৫. জগদীশচন্দ্র, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৪

৬. প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হয়। তার অবতরণিকাস্বরূপ 'পত্রপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'সেই তাঁর ধর্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জন পদ্মাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি।'

. The Life and Works of Sir Jagadis Chandra Bose,—Patrick Geddes, Longmans Greem & Co. 1920, p 222

৮. "লোকমাতা নিবেদিতা", প্রথম খণ্ড, শংকরীপ্রসাদ বসু, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ ৬২৩

৯. প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৩, পৃ ৪১২

১০. "চিঠিপত্র", ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ ১৫৬

১১. 'বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার'—জগদানন্দ রায়, ১৩১৯, পৃ ৫

১২. "লোকমাতা নিবেদিতা"—প্রথম খণ্ড, শংকরীপ্রসাদ বসু, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ ৬২৩

১৩. "জগদীশচন্দ্র", চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ ১২৬

১৪. মহিমচন্দ্র দেববর্মা, "ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ", দেশীয় রাজা, ওই গ্রন্থের "ত্রিপুরা প্রসঙ্গ" প্রবন্ধেরও কোনো-কোনো বাক্য এই উদ্ধৃতির অন্তর্গত।

১৫. জগদীশচন্দ্র, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৪

১৬. "চিঠিপত্র", ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ ১৩০

১৬. তদেব, পৃ ৪০

১৭. তদেব, পৃ ২৪

১৮. জগদীশচন্দ্র বসুর পুত্র, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৩

১৯. আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে জগদানন্দ রায়ের রচনাবলী ১৩১৯ সালে, "বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ভূমিকায় লেখেন,—'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থ প্রকাশে যে উৎসাহ দিয়াছেন'।

২০. জগদীচন্দ্র বসুর পত্র, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৩

২১. The Life and Works of Sir Jagadis Chandra Bose, Patrick Geddes, Longmans Green & Co. 1920, পৃ ২২৩

২২. গেডিস, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২২২

২৩. "চিঠিপত্র", ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ ১১৮

২৪. জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

২৫. জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র, প্রবাসী, ১৩৩৩

২৬. জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৩

২৭. চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ ২৬-২৭

২৮. জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৩

২৯. চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ ২৭

৩০. তদেব, পৃ ৩৯

৩১. "চিঠিপত্র", ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ ৬১-৬২

৩২. "চিঠিপত্র" ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭, পৃ ৪৬

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

দিল্লীর সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন—প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে

গার্গী চক্রবর্তী

["সংরক্ষণ" সম্প্রতি এদেশে উত্তপ্ত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। কেবল রাজনৈতিক নয়—সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রসঙ্গটি আলোচিত হচ্ছে। এই কারণে, দিল্লিবাসী অধ্যাপিকা গার্গী চক্রবর্তীর বিশ্লেষণাত্মক বিবরণটি প্রকাশ করা হল। —সম্পাদক।]

গত ছ মাস ধরে রাজধানী দিল্লির বুকে সংরক্ষণবিরোধী মনোভাব, জনমত এবং আন্দোলন যেভাবে ছড়িয়ে পড়ল, তাতে যে-কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চিন্তিত বোধ করবেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯৮৪-র নভেম্বরে এই শহরে আগুন জ্বালিয়েছে, কিন্তু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষ সেই বর্বরতাকে সমর্থন করেন নি। কিন্তু আজ এক ভিন্ন পরিস্থিতি, যদিও ১৯৮৪-র দাঙ্গাকারী শক্তিগুলি এবারেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

এই আন্দোলনের শুরুটা কেমন করে হল? মণ্ডল কমিশন রিপোর্টের সুপারিশ যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করলেন, তার দু-তিন দিনের মধ্যেই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলিট সংস্থাগুলি (যার মধ্যে পড়ে দিল্লি স্কুল অভ ইকনমিকস) মণ্ডল কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকরা—যেমন আন্দ্রে বেতিল, বীণা দাস, ধর্মা কুমার, নিবদ্ধ আর প্রবন্ধের মাধ্যমে এমনভাবে ছাত্রদের বোঝালেন যে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার। এতদিন যে একটা অলিখিত এবং অস্বীকৃত (unrecognised) কোটা ছিল সমাজের অগ্রণী বর্গের মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের জন্য—সে কথা বলা হল না। জনসংখ্যার ৬৫% থেকে ৮৫% যদি অনগ্রসর হয়, তাহলে এতদিনসরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে খালি মাঠে গোল করার মতো অবস্থা ছিল। এখনও ৫১·৩% চাকরি সমাজের ওই অগ্রণী ৩৫% জনসংখ্যার জন্য সীমিতই রয়েছে। অন্যদিকে, ৪৯·৭% চাকরির জন্য সমাজের অনগ্রসর বর্গ ৬৫% জনসংখ্যা। সংরক্ষণের প্রয়োজন স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরও রয়েছে, এটাই দুঃখের। এই চল্লিশ বছরে প্রকৃত সার্বজনিক শিক্ষার মাধ্যমে অনগ্রসর জাতিদের আগে আনার চেষ্টা মামুলিভাবে হয়েছে। মণ্ডল কমিশন রিপোর্টের মধ্যে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে, কিন্তু ছাত্রদের বোঝানোর কোনো চেষ্টাই হয় নি যে, ১৯৩১-এর কাস্ট-ভিত্তিক কোনো সেনসাস রিপোর্ট নেই। তাই অনগ্রসর জাতির যে তালিকা তাকে সময় অনুসারে ঠিক করতে হবে।

এসব কথা অনেকেই বোঝেন। কিন্তু মণ্ডল কমিশন রিপোর্টের মূল যে ভাবনা বা উদ্দেশ্য—সামাজিক বৈষম্য দূর করা—তার উপর অধ্যাপকরা কোনো আলোকপাতই করলেন না। যে সামাজিক কলঙ্ক আমাদের মধ্যে রয়েছে (উঁচু-নীচু জাতের পার্থক্য লোকের মজ্জাগত) তা থেকে সামাজিকভাবে অনগ্রসর জাতিগুলোকে ডিসিশনমেকিঙ কার্যকলাপে দায়িত্ব দেওয়া এবং চাকরির সমানতার মাধ্যমে এগিয়ে আনার প্রয়াস—তার কোনো উল্লেখ নেই। মুখে-মুখে প্রচার হল ভি. পি. মণ্ডল ধনী ঘরের ছেলে; কিন্তু বলা হল না যে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে গ্রামের স্কুলে আলাদা বেনচে বসতে হত। এস. সি. ব্রিল—যিনি মণ্ডল কমিশনের সম্পাদক ছিলেন—মানসিক বৈষম্যের এই তথ্যটি দেন। রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য আর্থিক বৈষম্য দূর করা নয়, মানসিক চেতনার পরিবর্তন আনা। ছাত্রদের বোঝানো হল—জাতিপ্রথা বেড়ে যাবে, ভারতে এ সমস্যা ছিল না। কিন্তু বর্ণ হিন্দুধর্মের গোড়ার কথা। বর্ণবৈষম্য রয়েছে। এটা সামাজিক সত্য (সোস্যাল রিয়লিটি)। ঘরে-ঘরে পইতা দেবার প্রচলন, পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনে জাতের উল্লেখ এবং পদবীর মধ্য দিয়ে জাতপাত যে রয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

মূল্যসমস্যা, বেকারি, নিরক্ষরতা ও অনগ্রসর জাতির সমস্যা—এসব না বুঝিয়ে সাংবাদিকরা তথ্যভরা প্রবন্ধের মাধ্যমে এমন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করলেন, যার ফলে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা, স্বর্ণপদকপ্রাপ্তরা মণ্ডল-কমিশন-বিরোধী আন্দোলন শুরু করল। মেধাবী ছাত্ররা এই আন্দোলন শুরু করায়, আন্দোলনের মান্যতা (ক্রেডিবিলিটি) বাড়ল। যেমন করে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের যোগদানে নকশালবাড়ি আন্দোলন স্বীকৃতি পেয়েছিল। আন্দোলন শুধুমাত্র মণ্ডল কমিশন রিপোর্টের আলোচনা, তর্কবিতর্কে সীমাবদ্ধ থাকে নি; ছাত্ররা ধর্মঘট করল, রাস্তায় নামল। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চৌমাথাকে "ক্রান্তিচক" নাম দিয়ে, সেখানে অবস্থানে বসল। অধ্যাপকরা নিয়মিত তাদের সমর্থন জানাতে ওই চৌমাথায় যেতেন। ক্লাসে-ক্লাসে আলোচনা চলল।

এই আন্দোলন এত ব্যাপক কেন হল? তার প্রধান কারণ জনসমর্থন। এবং জনসমর্থন বলতে ৯০% অধ্যাপকের সমর্থন, অভিভাবকদের সহযোগিতা, আমলাতান্ত্রিক চাকুরিজীবীদের পূর্ণ সহযোগ, এবং সবার উপর সাংবাদিকদের প্রচার।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আগাগোড়া খোলা ছিল, যদিও ক্লাসে পড়াশুনো বিশেষ হয় নি (মেয়েদের কলেজে তবু কিছুটা হয়েছে)। প্রথম চারটে ক্লাসের পর ছাত্রেরা রাস্তায় নামত। পথ-অবরোধ বেশ কদিন চলল। অধ্যাপকরা প্রায় সবাই মুখরিত। মণ্ডল কমিশনের পক্ষে একটা কথাও বলা যাবে না। দয়াল সিং কলেজে অধ্যাপক সাইনি এই রিপোর্টের পক্ষে কিছু বলায়, ছাত্ররা তাঁকে ঘরে বন্ধ করে রাখে। দিল্লি স্কুল অভ ইকনমিকসের উদ্যোগে এক আলোচনা-চক্রে স্বামী অগ্নিবেশকে ছাত্ররা ধাক্কা দিয়েছে, বলতে দেয় নি। কারণ, তিনি রিপোর্টের পক্ষে বলছিলেন। অন্যদিকে, রাজীব গান্ধীর ব্যক্তিগত সহায়ক মণি-শংকর আইয়ারের ভাষণে হাততালির ঢেউ উঠেছিল। অর্থাৎ কোনো বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক (ডিবেট) করার মানসিকতা নেই। সেমিনার, আলোচনাচক্র—সবই মণ্ডলকমিশন-বিরোধী গোষ্ঠীর সভা। মণ্ডল-কমিশন রিপোর্টের ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করেও তার মধ্যে যে ভালো কিছু আছে, সে কথা বলার অবকাশ নেই।

এই রিপোর্ট যে কাস্ট-এর আধারে তৈরি, সে কথা রাজনৈতিক দলগুলো জানতেন। গত দশ বছরে সেই কারণে এটাকে তৎকালীন সরকার প্রত্যাখ্যান কেন করলেন না? জনতা দল ছাড়াও বি. জে. পি. এবং কংগ্রেস—উভয়ের নির্বাচনী ইশতেহারে মণ্ডল-কমিশন রিপোর্ট সুপারিশ করার প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার ছিল। যখন সংসদে মণ্ডলকমিশন রিপোর্ট সুপারিশের কথা ঘোষণা করা হল, তখন বি. জে. পি এবং কংগ্রেস—কোনো দলই প্রতিবাদ করল না। বেশ কিছুদিন বড়ো-বড়ো নেতারা চুপ থাকলেন।

কিন্তু এই সংগঠনের জনসংস্থাগুলো প্রতিবাদে মুখর হল। দুই দল বিভিন্ন জনমোর্চায় পাল্লা দিয়ে দেখাতে লাগলেন—কে কত বেশি বিরোধী। এর প্রতিফলন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতিতে পড়ল। মণ্ডল কমিশন রিপোর্টের উপর আলোচনা করতে কারোই আপত্তি নেই। কিন্তু দুই দলের সদস্যরা ছাত্রদের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেবার জন্য সোচ্চার হলেন। বামপন্থীরা কোণঠাসা হলেন। সি. পি. এমের সদস্যরা সমিতির সভা বয়কট

করলেন। এবং বর্তমানে কংগ্রেস আর বি. জে. পির একত্রিত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সমিতি ছাত্রদের আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয় কার্যকলাপ শুরু করেছেন।

এবারে একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষণীয়। মহিলা অধ্যাপিকারা সংরক্ষণবিরোধিতায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন। সন্তানদের সরকারি চাকুরি লাভের সম্ভাবনা কমে যাবার আশঙ্কায় এঁরা বিহ্বল। এখানেও একটা মজার কথা বলি। লক্ষ করে দেখতাম, সহকর্মীরা কেউ বিশেষ চান না তাঁদের সন্তান স্কুলশিক্ষক বা অধ্যাপক হোক। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ডাক্তার, ইনজিনীয়র ছাড়াও IAS, IFS, IPS ইত্যাদি সরকারি অফিসার যদি সন্তানরা ভবিষ্যতে হতে পারে। এই প্রশাসনিক কাজের জন্য অর্থাৎ আমলা তৈরি করার জন্য ইঁদুর-দৌড় (র‍্যাট-রেস) দেখে অবাক হতে হয়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ কলেজ সেণ্ট স্টিফেন্স-এ ইতিহাস অনার্স নিয়ে ভরতি হয় প্রচুর ছাত্রছাত্রী। খুবই মেধাবী তারা। পরে জানলাম, ইতিহাস পড়বার জন্য নয়, ভবিষ্যতে IAS,IFS ইত্যাদি পরীক্ষায় বসবার জন্য। অন্যদিকে, দিল্লি শহরে বিহার এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র পড়তে আসে IAS, IFS অফিসার যাতে হতে পারে। আমলাতন্ত্রের প্রতি এই আকর্ষণ, কারণ এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক মর্যাদা। সোশ্যাল স্ট্যাটাস আমাদের মূল্যবোধে একটা মস্ত মাপকাঠি। তাই হোস্টেলের ছাত্ররা খেপে উঠেছে, যেন তাদের স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেল। ছাত্রদের দোষ দিই না। কারণ পুরো সমাজ, অভিভাবক, শিক্ষক সবাই "আরো চাই"-এর প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দিই। সবাইকে "best" হতে হবে, "first" হতে হবে—শিশু-বয়স থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে উপলক্ষ করে মায়েতে-মায়েতে মানসিকভাবে এক প্রতিযোগিতা চলে।

বর্তমানে ছাত্র এবং অধ্যাপকরা শুধু যে OBC (অন্যান্য অনগ্রসর জাতি)-দের ২৭·৯% কোটাতে ক্ষুব্ধ তা নয়, এমনকী এতদিন ধরে যে SC/ST-র ২২% চাকরির সংরক্ষণ ছিল, তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করছে। মেরিটোক্রেসি এবং স্ট্যানডার্ড—এই দুইটি পরাকাষ্ঠা শুনতে হচ্ছে। কোন্ নিয়োগ সত্যিকারের মেরিট-এর ভিত্তিতে হয়? যে প্রদেশে যারা শাসনে, তাদের আধিপত্য অস্বীকার করা কি যায়? দিল্লির একটি কলেজে অঞ্জনা কোলি নামে একটি মেয়ে গত পাঁচ বছর অস্থায়িভাবে অর্থনীতি পড়াচ্ছিল। সে সিলেকশন কমিটির সামনে ইনটারভিউ দিয়েই এই অস্থায়ী চাকরি পায়। শুনলাম মেয়েটি মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করেছে। এবং সেজন্যই নাকি ওই পোস্টটি যখন পারমানেন্ট হল, ওই মেয়েটিকে নেওয়া হল না। সে এখন বেকার। আমাদের সমাজের সোশ্যাল স্টিগমা কেউ কি অস্বীকার করতে পারেন? তা ছাড়া, যখন আমরা খাতা দেখি, তখন কোন্ ছাত্র SC/ST বা OBC ইত্যাদি মোটেও জানি না। তাই একজন পাশকরা ওই বর্গের ছাত্রের মেরিট কেন কম হবে? এটা ঠিক—খোলা প্রতিযোগিতায় এখনও ওরা পারবে না; তাই ওদের জন্য নির্ধারিত কোটা দরকার। কোনো প্রতিযোগিতা অসমানদের মধ্যে হয় না, সমানে-সমানে হয়। SC/ST বা OBC-রা এখনও অসমান। তাদের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে সমান করার কথা অনেকেই বলছেন, কিন্তু এতদিন চল্লিশ বছরেও কেন তারা অগ্রসর হয় নি? এর থেকেই বোঝা যায় —সমস্যা খুবই গভীর। তাই চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। নিশ্চয় চিরকালের জন্য নয়। কিন্তু বর্তমানে যে রয়েছে, সে বিষয়ে সবার কিছু ত্যাগ-স্বীকার করা উচিত। আমরা একুশ শতাব্দীতে যাব অথচ ৬৫% লোক অনগ্রসর থাকবে সামাজিকভাবে—এটা তো আমাদের লজ্জা এবং অপমান। এই রাষ্ট্রীয় চেতনা বা সোশ্যাল কমিটমেনট আমাদের নেই।

যাঁরা মনে করেন এই রিপোর্টের ওপর জাতপাত বেড়ে গেল (যেন আগে ছিল না)—তাঁদের কাছে

আমাদের কলেজের একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অধ্যাপিকাদের জন্য একজন মহিলা-পিওন আছেন যিনি আমাদের খাবার জল দেন, চা আনেন, চিঠিপত্র দেন ইত্যাদি। একদিন তিনি আসেন নি। সেদিন আমাদের জমাদারনি কমলা গেলাস ধুয়ে খাবার জল রেখে যায়। ঘটনাটি বছর চার আগের। আমাদের কলেজের অধ্যাপিকা সমিতির সম্পাদিকা হিসাবে অনেক সহকর্মী আমাকে বললেন, কমলা যেন জল না রাখে। কতদৃষ্টান্ত দেব? পাড়ায় দুর্গাপূজায় দুর্গাঠাকুরের ভোগ রান্নার জন্য মহিলারা ব্রাহ্মণ মহিলার খোঁজ করছিলেন। বিবাহের ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহ হলেও একটা "কিন্তু-কিন্তু" ভাব থাকে। উঁচুজাতের পাত্রপাত্রীর অন্যজাতে বিবাহ হলে মনে করে "নীচে নামলেন"। উঁচুজাতের গরিমা ধমনীতে এবং তেমনি নীচজাতের হীনতাবোধ রক্তের মধ্যে। পদবীই বুঝিয়ে দেবে কে কোন্ জাতের। আজকালে পইতের অনুষ্ঠান মাত্রাধিকভাবে বেড়ে চলেছে। কিসের উপবীত? উপবীতের মধ্য দিয়ে সে কী বহন করছে? শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের পর ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রাহ্মণদান এখনও সমাজে চলে আসছে। আমাদের পরিচিত শুভাশুধ্যায়ী তাঁর দাদার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ-ভোজনের পরিবর্তে চণ্ডালভোজন করিয়েছিলেন। অনাথ শিশু বা কাঙালিদের দান করে কি তৃপ্তি হয় না? দানের পাত্র ব্রাহ্মণই হতে হবে কেন? এককালে পণ্ডিতরাই শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু আজ নানা জাতের মানুষ, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, সবাই শিক্ষকতা করেন। সেই যুক্তিতে তো পুরোহিতের কাজ অব্রাহ্মণরাও করতে পারেন। যিনি সংস্কৃত শ্লোক সুন্দরভাবে উচ্চারণ করেন এবং বোধগম্য করে তোলেন এবং যাঁর মধ্যে ভক্তিভাব আছে, তিনি অব্রাহ্মণ হয়েও পুরোহিত কেন হতে পারবেন না?

এই প্রশ্নগুলো এজন্যই করলাম, কারণ মণ্ডল-কমিশন রিপোর্টের পর যে ঝড় উঠেছে, সেই ঝড়ে আমার মতো অনেকের চোখ খুলেছে। এই ঝড়ে দেখলাম উঁচুজাতের লোকেরা নীচুজাতের লোকেদের কত হীন, তুচ্ছ, মেধাহীন মনে করছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে যেসব অনগ্রসর জাতির ছাত্র আছে, তাদের মনের কথা কেউ তলিয়ে কি দেখেছে? আলাদা টেবিল এখন করে দিল খাবার জন্য। এই শ্রেণীর এক ছাত্র সম্প্রতি ছদ্মনামে "Mainstream" (October 6, 1990) পত্রিকায় লিখেছে—'My heart bleeds when my self-immolating brethren writhe in agony and pain. Everyone cries for them. But when together with the other SC, ST and OBC students I suffer indescribable mental humiliation no one cares. Should we resort to the same tactics : offering ourselves in physical self-immolation ? Perhaps, only then would the 'just' world be moved by our cries. But would it ?'

দিল্লিতে প্রথম যে আত্মদহনের ঘটনা হল, তার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ছেলেটির নাম রাজীব গোস্বামী, দেশবন্ধু কলেজের ছাত্র। শোনা গেছে, ছেলেটির গায়ে অন্য ছাত্ররা পেট্রল ছড়িয়েছে। এবং পুলিশ একদিকে তাকে টানতে চাইছে আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য, অন্যদিকে ছাত্ররা ধাক্কা দিচ্ছে আগুনের দিকে। টানাটানিতে সময় গেছে। এটা ঘটল কলেজের সামনে। আগের দিন ৪৫ জন ছাত্র ও ৪ জন অধ্যাপক আত্মদহন করবেন—তাঁদের নাম দিয়ে লিফলেট ছড়ানো হল। সে লিফলেট ওই অঞ্চলের লোকের মধ্যে আবেগ আর উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এবং এই আত্মদাহের ঘটনাকে মিডিয়া মারফত গ্লোরিফাই করা হল। সেই সময় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে বি. জে. পি-র নির্বাচিত অধ্যাপিকা এই ত্যাগকে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে তুলনা করলেন। তারপর আমরা রাজীব গোস্বামীর মৃত্যুর

বিচারবিভাগীয় তদন্তের জন্য দাবি জানালাম, লক্ষ করলাম কংগ্রেস আর বি. জে. পি-র সদস্যরা চুপ করে রইলেন, কোনো সমর্থন জানালেন না।

দিল্লীতে রাস্তায়-রাস্তায় পোস্টার—'ভি. পি. হঠাও, ছাত্র বাঁচাও।' মূল উদ্দেশ্য ভি. পি. সিঙকে সরানো। তাই এই সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বলা মুশকিল। রাজনৈতিক সংগঠনগুলো পেছন থেকে কলকাঠি নাড়াচ্ছে। কিন্তু "অ্যানটি-মণ্ডল কমিশন ফোরাম" নিজেদের অরাজনৈতিক বলে ভ্রান্ত এক ধারণা দেবার চেষ্টা করছে। "অসামাজিক শক্তিগুলো" শয়ে-শয়ে বাসের জানলা ভাঙছে, পাথর ছুড়ছে—সেই পাগলামি বন্ধ করছে না। ২রা অক্টোবরের বোট ক্লাবের সমাবেশে সেই শক্তিগুলো হিংসায় উন্মত্ত হল। তিকায়েত উশকানি দিলেন—এতে পরিষ্কার যে এর মূল উদ্দেশ্য অরাজকতা সৃষ্টি করা। নয়তো সুপ্রীম কোর্টের আদেশের পর ২রা অক্টোবরের ওই ঘটনা হতে পারে না।

আর এই উত্তেজনায় পত্রিকাগুলি দায়িত্বহীন ভূমিকা নিয়েছে। সাংবাদিকরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্বরতা এক কলামে লিখবেন, হরিজনদের পোড়ালে আধা কলামে, আর এইসব আত্মদাহের ঘটনা চার কলামে। ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের মাথায় একটা পাগলামি চাড়া দিয়েছে—তার জন্য দায়ী মিডিয়া এবং তাদের অভিভাবক। বাড়িতে এমন আলোচনা চলছে যাতে এইসব সেনসিটিভ বয়সের ছেলেমেয়েদের উত্তেজনা বাড়ছে। মনে হচ্ছে, কোনো চাকরি পাবে না। অনগ্রসর লোকেরা "অশিক্ষিত" থেকেই যেন চাকরি পেয়ে যাবে। একেকটি মধ্যবিত্ত পরিবারে কজন সরকারি চাকরি করেন? প্রাইভেট সেকটরে এটি প্রযোজ্য নয়। রাজ্যসরকারের ওপর এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তারা সুপারিশ করবে কিনা! হিমাচল প্রদেশের বি. জে. পি. মুখ্যমন্ত্রী শান্তাকুমার মণ্ডল কমিশন রিপোর্ট সুপারিশ করবেন না ঘোষণা করার পরও ওই প্রদেশে হিংসাত্মক ঘটনা আর আত্মদানের সংখ্যা কম যাচ্ছে না। এর অর্থ কী? মজার ব্যাপার, মধ্যপ্রদেশের বি. জে. পি. দলের মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্ট সুপারিশ করবেন না, এমন ঘোষণা করলেন না। সেইরকম কংগ্রেসের রাজীব গান্ধী তীব্র সমালোচনা করলেও, চন্দ্রজিৎ যাদব বড়ো মিটিং করেছেন এর পক্ষে। অর্থাৎ বি. জে. পি এবং কংগ্রেস নিজেদের সুবিধেমতো নীতি চালু রাখছে—যেখানে যেমন দরকার। "Sunday Observer"-এর 29 September 1990 সংখ্যায় তথ্য রয়েছে এইচ. কে. এল. ভগত এবং তাঁর অনুচরেরা এই সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন সহায়তা করছেন। সফদরজঙ্গ হাসপাতালের সামনের চৌমাথাকে ছাত্ররা "কুর্বানি-চক" নাম দিয়েছে। তারা যখন পথ-অবরোধ করে সেখানে দিনের পর দিন বসে ছিল, তখন কংগ্রেস কর্মীরা ওখানে যেতে পারতেন, কথা বলতে পারতেন। শোনা গেছে, অবস্থানরত ছাত্ররা OBC কাকে বলে জানে না। এক কংগ্রেস কর্মীর মুখেই শুনলাম। এমনকী বি. জে. পির আদবানি ও খোরানাকেও ধ্বস্তাধ্বস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারের প্রতি বি. জে. পি. কেন এখন সমর্থন উঠিয়ে নিচ্ছে না—এটাই তাদের ক্ষোভ।

গত পরশু সীমা গুপ্তা নামে কলেজের ছাত্রী আত্মদাহ করে এবং তার মা প্রকাশ্যে বলেছেন, এতে আমার কোনো অনুতাপ (রিগ্রেট) নেই। অভিভাবকরা বোঝানোর চেষ্টা না করে, আরো বেশি উৎসাহ দিচ্ছেন। যেন বীরাঙ্গনার জননী, এমন ভাব দেখাচ্ছেন।

অগস্ট মাসে যখন আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন ছাত্রীরা পোস্টার নিয়ে মিছিল করল: 'We do not want unemployed husbands'—এই হল মূল্যবোধ নারীশিক্ষার! তারপর বুটপালিশ, ঝাড়ুওয়ালা—এইসব করে যে হীনতার পরিচয় তারা দিয়েছে, নীচুজাতের প্রতি যে অবহেলনা, যেন কিছু লোক চিরকাল বুটপালিশই

করবে—এই মনোভাবে কিছু লোকের সহানুভূতি ছাত্ররা হারিয়েছে। লেখাপড়া শিখেও যদি বুটপালিশ করতে হয়—এই তাদের আশঙ্কা। কিন্তু যারা যুগ-যুগ বেড়ার ওধারে দাঁড়ানো ওইসব 'মূঢ় ম্লান মূখ' দেখেও বোঝে না—এদের সমান দরজায় আনতে হবে। শুধু শিক্ষা দিয়েও হবে না। কারণ একটা গ্যাপ তাতেও থাকে। দু-একটা জেনারেশনের পর সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়তো থাকবে না।

আমাদের দেশে গান্ধীজীকে নিয়ে উৎসব হয়। তিনি যে হরিজনদের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সে কি আমরা ভুলে গেছি? স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত সেইসব উক্তি ছাত্ররা কি শুধু পাঠ্যপুস্তকেই পড়বে? রাইট টু ওয়ার্ক—সবার জন্য। সবাই যাতে চাকরি পায়—সেটাই কাম্য। সবাই যাতে প্রকৃত শিক্ষা পায় এবং সামাজিক মর্যাদা পায়, সেই জন্য নতুন করে সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজন আজ বড়ো বেশি। যে ধর্মে সোস্যাল মোবিলিটি নেই, সেই ধর্মের শৃঙ্খল ভাঙা দরকার। সবচেয়ে বড়ো ধর্ম মানবতাবোধ। একসময় বহু লোক বৌদ্ধ, মুসলিম, শিখ ও খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। যুগে-যুগে এই ধর্মান্তর হয়ে এসেছে। সেই দিকে ঠেলে দেওয়াই কি একমাত্র রাস্তা? এটাই ভাবতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ইসলাম

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

হাজার আঘাত উপেক্ষা করে এই উপমহাদেশে হিন্দু এবং মুসলমান দুই গোষ্ঠীর সহাবস্থান অব্যাহত আছে। এ দেশের এক সাহিত্যের আঙিনায় উভয়েরই গতায়াত। উভয়-ধর্মীয় সংস্কৃতির সহমেল অনেক জায়গায়ই লক্ষ করা যায়। জাতীয় সুখে-দুঃখে সমান শরিক হয় উভয়েই। তবু যখন ইদানীং নতুন করে সাম্প্রদায়িকতার জিগির ওঠে—শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—আগ্রাসী হিন্দু মৌলবাদী ধর্মান্ধতা মুসলমানকে বহিরাগত বলে চিহ্নিত করে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুদারতায় মুসলমান সংস্কৃতি বিপন্নতায় শঙ্কায় অধীর, তখন মুসলমান সমাজের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের মানসিকতা-বিশ্লেষণ বিশেষ জরুরি। কারণ ভারত-তথা বিশ্ব-ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভারতাত্মার বিশুদ্ধ-রূপ'[১] বা 'entire orbit oI Hinduism'[২] বলে কথিত। এ-জাতীয় ভাবভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বড়োই প্রাসঙ্গিক, কারণ তিনি সারা জীবন ধরে ধর্মের সাধনায় রত ছিলেন।

২

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কোনো এক সময় দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির বাগানে আসেন ইসলামসাধক গোবিন্দ রায়। তিনি ছিলেন সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধনের অনুকূল স্থান বুঝে তিনি পঞ্চবটীর বাগানে কিছুকাল অবস্থান করেন। তখন কালীবাটীতে মুসলমান ফকির-দেরও সমাদর ছিল। আরবি আর ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ইসলামসাধক গোবিন্দ রায়ের সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর কাছ থেকে ইসলামের রহস্য জানতে আগ্রহী হন। পরিশেষে তিনি গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লামন্ত্র গ্রহণ করেন। ইসলামধর্মসাধন-কালে, তিনি মুসলমানদের প্রিয় খাদ্য এমনকী গোমাংস পর্যন্ত গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। মথুরবাবুর একান্ত অনুরোধে ওই উদ্যোগ বন্ধ হলেও, সেই সময় তিনি মুসলমান পাচকের রান্না খাবারই গ্রহণ করে-ছিলেন। "লীলাপ্রসঙ্গ"কার উল্লেখ করেছেন যে, 'ঠাকুর বলতেন, "ওই সময়ে মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নামাজ

পড়িতাম এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুদেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ওইভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ওই মতের সাধনফল সম্যক্ অবগত হইয়াছিল।"[৩] সাধনকাল শেষ হলে শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ-শ্মশ্রুবিশিষ্ট সৌম্যমূর্তি জ্যোতির্ময় পুরুষ মহম্মদের দর্শন পান।[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিকবার মসজিদে গেছেন। 'ইসলাম সাধনের সময় দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী মসজিদে নামাজ পাঠ করেছিলেন। তা ছাড়াও গেঁড়েতলার মসজিদে তিনি গিয়েছিলেন এবং জনৈক মুসলমান ফকিরের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হয়েছিলেন'।[৫]

মুসলমান সম্প্রীতি তাঁর মজ্জাগত ছিল—তাঁর ঐতিহাসিক উদ্ধৃতির মধ্যে সেই সত্য পরিস্ফুট। ইসলাম সাধনের সতেরো বছর পর তিনি বলেছিলেন, 'আমি একদিন দেখলুম এক চৈতন্য—অভেদ। প্রথমে দেখালে, অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েছে। তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুচ্ছফরাস, কুকুর; আবার একজন দেড়ে মুসলমান, হাতে এক সানকি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই সানকির ভাত সবাইয়ের মুখে একটু-একটু দিয়ে গেল। আমি একটু আস্বাদ করলুম।'[৬]

তিনি তাঁর আরাধ্য ঈশ্বরকে 'আল্লা' নামে ভূষিত করতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁর পরিণত বয়সের সিদ্ধান্তে সেই শপথ লক্ষ করা যায়: 'যতলোক দেখি, ধর্ম-ধর্ম করে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাকে কৃষ্ণ বলছো, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়।'[৭]

ধর্মীয় হানাহানি বা সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির পরিপন্থী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে গরমিল আর মনোমালিন্য, তা প্রতিরোধের জন্য ধর্মতত্ত্বকে তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। তাঁর বক্তব্য হল, 'বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা একঘাট থেকে জল নিচ্ছে, কলসী করে—বলছে 'জল'। মুসলমানরা আর-এক ঘাট থেকে,—বলছে 'পানি', খ্রীষ্টানরা আর-এক ঘাট থেকে জল নিচ্ছে—তারা বলছে 'ওয়াটার'।"[৮] তাঁর উদ্ধৃতির তাৎপর্য হল—'জল' যেমন জাতিভেদে 'ওয়াটার' বা 'পানি' নামে চিহ্নিত হয়, অনুরূপ 'সত্য' জাতিভেদে 'গড' বা 'ব্রহ্ম' বা 'আল্লা'র নামেই পূজিত হয়। কাজেই 'ধর্মীয় সংঘাত নেহাতই অজ্ঞানতা-প্রসূত প্রক্ষোভ পোষণ'—যার কোনো ব্যবহারিক বা নৈতিক মূল্য নাই। ধর্মীয় অভেদ-তত্ত্ব তাঁর মুখ্য ধর্মসাধনা। তাই বলতেন, 'বাউল সিদ্ধ হলে সাঁই হয়। তখন সব অভেদ। অর্ধেক মালা গোহাড়, অর্ধেক মালা তুলসীর। হিঁদুর নার—মুসলমানের পীর।'[৯]

তাঁর একাধিক গল্পকথিকার মধ্যেও মুসলমান সমাজের বিভিন্ন নর-নারীর বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কেউ বাদ যায় নি—'তত্ত্বজ্ঞানী ফকির'[১০], 'চরিত্রবান পুরুষ'[১১] ও 'ভোজনরসিক কুস্তিগীর'[১২]। বিস্ময়ের সঙ্গে আরো লক্ষের বিষয় হল, তাঁর ভাবরাজ্যে মুসলমান বালিকার উপস্থিতি। তিনি উল্লেখ করেছেন, [ভাবকালে] 'আর একদিন মুসলমানের মেয়েরূপে [মা] আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায় তিলক, কিন্তু দিগম্বরী। ছয়-সাত বছরের মেয়ে—আমার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়াতে লাগল ও যদ্ধকিমি ক'রতে লাগল।'[১৩]

৩

কেবল নিজস্ব মানসিকতার উদাহরণই নয়, তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যেও এই প্রত্যয়ের সতত সঞ্চালন ঘটিয়েছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবী

উনিশ শতকের বাঙলা সমাজে দরিদ্র মুসলমান শ্রমিক আমজাদকে আপন গৃহমধ্যে খাবার পরিবেশন করে তার উচ্ছিষ্টস্থান স্বহস্তে পরিষ্কার করেছেন। এর জন্য তিনি কোনোরূপ সঙ্কোচ অনুভব করেন নি। এমনকী জনৈকা আত্মীয়া এই ব্যাপারে তাঁকে অনুযোগ করলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।'[১৪] জয়রামবাটী গ্রামের নিকটবর্তী শিরমণিপুরস্থ তুঁতে ডাকাত ধর্মে মুসলমান। সে-ও শ্রীশ্রীমার স্নেহধন্য। সে চাষের কলা আর অন্যান্য সামগ্রী ঠাকুরের জন্য শ্রীমার নিকট আনলে শ্রীশ্রীমা হাত বাড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে নিতেন। একে মুসলমান —তার ওপর ডাকাত—সেই কারণে জনৈকা স্ত্রীভক্ত শ্রীশ্রীমার সমালোচনা করলে তিনি তা গ্রাহ্য করতেন না। বলতেন—'কে ভালো কে মন্দ আমি জানি।'[১৫] শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাব পূর্ণমাত্রায় স্বামীজীর ওপরও বর্তেছিল। 'শূদ্রের গলায় ব্রাহ্মণের পৈতে ঝুলিয়ে দিয়ে, ভাঙ্গী এবং মুসলমানের হাতে অন্ন গ্রহণ করে তিনি (স্বামীজী) জাতিহীন, বর্ণহীন, শ্রেণীহীন, সম্প্রদায়হীন এক মহান ও মিলিত ভারতবর্ষের আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।'[১৬] স্বামীজীর পূর্ণাঙ্গ ভারতসূত্রের প্রধান এবং প্রথম শর্তই ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। বন্ধু মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখিত স্বামীজীর চিঠি সেই ঐতিহাসিক ভাষ্যের সাক্ষর,—'আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। ...আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা।'[১৭] স্বামীজীর এই প্রত্যয়ের কথা সিস্টার ক্রিস্টিনও উল্লেখ করেছেন—'To him India was not the land of the Hindus only, it included all. 'My brother the "Mohammedan" was a parse he often used.'[১৮]

৪

শ্রীরামকৃষ্ণের মুসলমানসম্প্রীতি কেবল একতরফাই নয়। তিনি যেমন মুসলমান সমাজ ও ধর্মকে তাঁর জীবনচর্চার অঙ্গাঙ্গী করেছিলেন, মুসলমান সমাজও তাঁর ভাবে আবিষ্ট না হয়ে থাকতে পারে নি। আবু হোসেনের গানে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়: 'রাম রহিম না জুদা কর কর ভাই / দিল কো সাচ্চা রাখো জী।'[১৯] ওই সুর ছিল শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে: 'সবল হলে শীঘ্র ঈশ্বর লাভ হয়। কয়েক জনের ঈশ্বরলাভ হয় না—যার বাঁকা মন, সরল নয়—যার শুচিবাই; যারা সংশয়াত্মা।'[২০] আবদুল মজিদের কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনার অপরূপ মূর্তি ফুটে উঠেছে:

নররূপী নারায়ণ
তোমার মাঝেতে রাম ও কৃষ্ণের
দেখেছি সম্মিলন।
ত্রেতায় শ্রীরাম, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ
তাঁদের দেখি নি চোখে
মানুষের ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ
দেখিনু মর্ত্যলোকে।[২১]

শ্রীরামকৃষ্ণের সারল্য সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় আরো বাঙ্ময়: 'পরমহংসের কাছে আসার পূর্বেই চোখে পড়বে লোকটি কী সরল। এগিয়ে এলে বোঝা যায়, এঁর বাহির-ভিতর দুই-ই সরল। এঁর শরীরটি যেমন পরিষ্কার, এঁর মনটিও তেমনি পরিষ্কার। এঁর মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলে নি।'[২২] আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্ মহম্মদ দাউদ রাবার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ভাবনায় প্রত্যক্ষ করলেন, ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানীর প্রজ্ঞা। তিনি লিখলেন, 'ধর্মের

ক্ষেত্রে ক্ষমতার লড়াই প্রচণ্ড। ধর্মীয় নেতৃত্বে যে অসাধুতা আছে তা দূরীকরণে বৈজ্ঞানিক ও ধর্ম-নিরপেক্ষবাদীদের অবদান নিঃসন্দেহে অধিক। কিন্তু ইদানীং ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও প্রকাশ পাচ্ছে এক ধরনের পৈশাচিকতা যা একদা কোনো-কোনো পুরোহিতদের মধ্যেই দেখা যেত। ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানীদের মুখে দীপ্তি ও মহানুভবতা কদাচিৎ দেখা যায়। সরল নিষ্পাপ শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁর আপন অধিকারে একজন সহজাত গুণসম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন না?'[২৩]

৫

এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পিছনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকলেও 'ধর্মগত কারণ'[২৪] কোনো অংশে গৌণ নয়। অন্তত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর ক্ষেত্রে 'ধর্মতান্ত্রিক মৌলবাদের'[২৫] ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় মৌলবাদের অমানবিক, অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণপ্রজ্ঞা বারবার ধিক্কার জানিয়েছে। ধর্ম নিয়ে কোলাহলকে বলেছেন 'মতুয়ার বুদ্ধি—এ বুদ্ধি খারাপ'।[২৬] কোনো ধর্মেরই আগ্রাসী মনোভাব তাঁর কাছে সমর্থন পায় নি—সে হিন্দুধর্ম হলেও নয়। সমন্বয়ই ছিল তাঁর সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: 'যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে।'[২৭] তাঁর মুসলমান-সমাজের প্রতি সম্প্রীতি এবং মুসলমান সংস্কৃতিকে আত্তীকরণের আগ্রহ অন্তত আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, 'ভারত-ধর্মে' মুসলমান সংস্কৃতি কেবল অত্যাবশ্যকীয়ই নয়—অনিবার্যও বটে। তাঁর এই কঠিন প্রত্যয়েরই বাণীমূর্তি হল: 'পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহের সুচারু সমন্বয়'[২৮]—যা তাঁর প্রিয় শিষ্যের (স্বামীজীর) লেখনীতে নিঃসৃত হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রত্যয়-সিদ্ধ এই শিক্ষাই সমস্যাজর্জর ভারতের শান্তি ও অখণ্ডতা রক্ষার একমাত্র চাবি-কাঠি।

তথ্যসূত্র:

১ দেশ, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮, পৃ ১১-১৬; জার্মান পর্যটক ম্যাক্সিমিলিয়াম রাগিস্ট তাঁর লেখনীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'ভারতাত্মার বিশুদ্ধ রূপ' বলে বর্ণনা করেছেন।

২. Hinduism Through the Ages—D. S. Sarma, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay (1955), p 125।

৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, (অখণ্ড সংস্করণ), 'দিব্যভাব', পৃ ৩১০।

৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, (১৩৯০), পৃ ৩৭।

৫. ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ৩য় সংস্করণ (১৩৯৩), পৃ ১২৮-২৯।

৬. তদেব, পৃ ১২১।

৭. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, কথামৃত ভবন, কলিকাতা, ২।১৩।৩।

৮. তদেব, ২।১৩।৩।

৯. তদেব, ৪।১৮।১।

১০. তদেব, ৩।১০।১।

১১. তদেব, ৪।১৮।৪।

১২. তদেব, ৪।১।১।

১৩. তদেব, ৪।১।২।

১৪. শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা। ৫ম সংস্করণ (১৩৮১), পৃ ৪০০-৪০৪।

১৫. তদেব, পৃ ৪০৩।

১৬. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ (সম্পা: লোকেশ্বরানন্দ): যুগনায়ক ও দেশনায়ক: স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার; গোলপার্ক, (১৯৮৮) পৃ ৯১৫।

১৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪), পৃ ৩০।

১৮. Reminiscences of Swami Vivekananda—His Eastern and Western Admirers, Advaita Ashram, Calcutta, first edition (1961), p 208।

১৯. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ—সম্পা: স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী চৈতন্যানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পৃ ৫১৭।

২০. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৫।১৬।৪।

২১. আনন্দবাজারপত্রিকা, ১লা মার্চ, ১৯৫৪; 'নমো রামকৃষ্ণ' দ্রষ্টব্য।

২২. উদ্বোধন, ৫৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (ফাল্গুন, ১৩৬১), 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব', পৃ ৮৫-৯০।

২৩. বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ—পৃ ৮৯৭।

২৪. Communalism in Modern India—Bipan Chandra। Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi, Second Edition (1987), p 166.

২৫. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৬৮।

২৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।২।৫।

২৭. তদেব, ৪।১৫।১।

২৮. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ (১৩৮৪) পৃ ৩৯।

সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

ক্রুবেৎসকয়, ফার্দিনান্দ দ্য সসিউর, ইয়াকবসন, ব্লুমফিল্ড, ফার্থ, আন্দ্রে মার্তিনে, জোন্স ও চমস্কির নতুন সমীক্ষা ভাষাতত্ত্বকে একটি পরিচিত বিষয় হিসাবে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাষাতত্ত্বে পদ্ধতিপ্রয়োগে ভাষার ইতিহাস, গঠন ও ব্যবহারিক রূপ বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। ভাষাতত্ত্বে প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলি অনুসন্ধান করা হয় : ক. মানবভাষার প্রকৃতি ও ব্যবহারগত দিক ; খ. ভাষার গঠন ও ইতিহাস ; গ. প্রয়োগ-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা ; ঘ. ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টির বিষয়ীভূত বস্তুগত দিক। বর্তমান শতকে পদার্থ-বিজ্ঞানে কুয়ানটাম থিওরি, জীববিজ্ঞানে মিউটেশন, মনস্তত্ত্বে গেসটালট থিওরি-র সঙ্গে রিলেটিভিটি, ইলেকট্রনিকস, কলোয়ডাল কেমিস্ট্রি, সাইকো-অ্যানালিসিস, বিহেভিয়ারিজম, অ্যাটমিক্স সাইবার-নেটিক্স যুক্ত হয়। ভাষাতত্ত্বে সমশ্রেণীর পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিহেভিয়ারিয়াজিমের সঙ্গে মেনটালিজম, মনস্তত্ত্ব, গণিত, পরিসংখ্যান, কমপিউটার ও ইন-ফরমেশন থিওরি ভাষাতত্ত্বের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। এর পাশাপাশি ভাষাতাত্ত্বিকরা উৎসাহী হয়ে উঠেছেন ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ ভাষার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার গঠনবিন্যাস বিশ্লেষণে।

এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার ওপর চৌত্রিশজন সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীর প্রবন্ধ বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত। চীনা, জাপানি, মঙ্গোলীয়, হিব্রু, ইরানি, কোরীয়, নেপালী, হিমালীয়, মেলানেসীয়, থাই, বাঙলা, দ্রাবিড়ীয়, তিব্বতি ও হিন্দি ভাষাবিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে। ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সম্পাদকদ্বয় নির্বাচন করেছেন —সাধারণ ভাষাতত্ত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতি, সমাজভাষা-বিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণীয় সমীক্ষা, ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনিবিজ্ঞান ও শব্দপ্রকরণ। লক্ষণীয় যে, ভাষাতত্ত্বের তিনটি প্রধান শাখা—রূপমূলতত্ত্ব, বাক্য-তত্ত্ব ও বাগর্থতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সমকালীন ভাষাতত্ত্বে বাক্যতত্ত্ব ও বাগর্থতত্ত্ব আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞানীদের অবদান অনস্বীকার্য।

সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রধান পার্থক্য তত্ত্বপ্রয়োগ ও বিশ্লেষণরীতির। বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ভাষা-বিজ্ঞানীরা নিজেদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, গ্রন্থের পরিচিতিপর্ব লক্ষ করলে তা বোঝা যায়। এই আলোচনায় নতুন কোনো দিকনির্দেশ অলক্ষণীয়। ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গ্রন্থে যে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত, তার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, আলোচনায় সাধারণ বক্তব্য উপস্থাপিত। বক্তব্যের পাশাপাশি সর্বত্র প্রমাণ হিসাবে উদাহরণ উপস্থাপিত হয় নি বলে বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন আলোচনায় সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীদের যে মনোভাব প্রতি-ফলিত, তার মধ্যে ভাষাতত্ত্বের অনেক শৃঙ্খলা অনুপস্থিত। ওলগা আখমানোভা ও গালিনা মিকায়েলানের মতো সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীরা আধুনিক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন সমধারিক বিদ্যাসকৌশলের সঙ্গে তত্ত্বগত প্রয়োগ বর্তমান সংকলনে অলক্ষণীয়।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধে ভারতীয় ভাষার ওপর প্রবন্ধের সংখ্যা স্বল্পতর (ছয়টি)। এর মধ্যে চারটি প্রবন্ধে হিন্দি, একটিতে বাঙলা ও অপরটিতে দ্রাবিড়ীয় ভাষা অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ওপর প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে গবেষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হতেন। সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ওপর বহু পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বতন্ত্র ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থগুলি রুশ ভাষায় লিখিত হলেও কয়েকটি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ আছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থে ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীদের পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বীয় দিক প্রতিফলিত। এর পাশাপাশি সোনজা এল. সিজিকোভা, আলেকসিভা, আপ্রোনভ, বিকোভা, সেভকিনা, কারপুশকিনের বাঙলার ওপর গবেষণা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এঁদের ভাষাসমীক্ষা যুগোপযোগী এবং আধুনিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ।

গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ (দি স্টাডি অব ওরিয়েনটাল ল্যাঙ্গুয়েজেস : দেয়ার ইম্পর্ট্যান্স ফর দি ডেভলেপ-মেনট অব জেনারেল লিঙ্গুয়িসটিক্স) সাতজন ভাষা-বিজ্ঞানী কর্তৃক লিখিত হওয়া সত্ত্বেও অসম্পূর্ণতা লক্ষণীয়। সিলেবল ও ফোনিম অংশে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হলেও ভাষার উদাহরণ সমীক্ষায় অনুপস্থিত। টোন সম্পর্কে আলোচনায়ও একই অসম্পূর্ণতা লক্ষ করা যায়। জাপানি ভাষা আলোচনায় ম্যাকলে, হ্যালে, বুফেদা ও কুনোর অবদান অনুল্লিখিত। অথচ, এই ভাষাবিজ্ঞানীরা জাপানি ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের বিস্তৃত এবং সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ইয়োরোপীয় ভাষার ব্যাকরণীয় গঠন সমধারিক বলে যে মন্তব্য উপস্থাপিত, তা অগ্রহণযোগ্য। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, সব ইউরোপীয় ভাষা ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত নয় ; দ্বিতীয়ত, ভাষাগত গঠনে অনৈক্য বিদ্যমান। ফরাসির সঙ্গে ইংরেজির তুলনা করলেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ভাষা ও সংস্কৃতি এবং সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের ওপর সাবরাটোভ, কিসোনিওভা, চেরনিসভ ও কোনদ্রাস-কিনার প্রবন্ধে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাত। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের পাশাপাশি ল্যাবভ, ল্যাকভ, ডেল হাইমস, গ্রীনবার্গ, লেভি-স্ট্রাউস, ম্যালিনস্কি, হোইয়ার, হ্যাস, সিবিওক, গাম্পার্জ, ওয়াইনরাইখ, ফিশম্যান প্রভৃতি সমাজ-বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা যায়। এঁদের প্রবন্ধে ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বীয় প্রেক্ষাপটে ভাষা-সমাজের বিবিধ জটিল সমস্যাগত দিক উদ্‌ঘাটিত। সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীরা ভাষা-সমস্যার দিকগুলি উদ্‌ঘাটনের সময় অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার অন্তর্নিহিত রূপটি নির্দেশ করেন না বলে সমস্যার ওপর আলো প্রতিভাসিত হয় না।

বর্তমান সংকলন দুটি দিক থেকে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমত, সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীদের তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় এবং দ্বিতীয়ত, এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে অনু-সন্ধিৎসা। সংকলনের দ্বিতীয় ও পরবর্তী পর্যায়ে অন্তরভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে ভাষাসমস্যা আলোচনায় অন্তরদৃষ্টি প্রতিফলনের সঙ্গে বিস্তৃত বিশ্লেষণ সমস্যার মূল দিক উন্মোচনে সহায়ক হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণীয় সমস্যা অংশের প্রবন্ধে ভাষা-বৈশিষ্ট্য দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষিত।

ভূমিকাংশে সম্পাদকের মন্তব্যের অংশবিশেষে অতিশয়োক্তি লক্ষ করা যায়। যেমন, সোভিয়েত পীর, ইয়েট অ্যানাদার স্পেস ফর কমিউনিকেশন, অস-পিসিয়াস কোয়েনসিডেন্স ইত্যাদি। স্পেস জার্মিতে সোভিয়েত নভশ্চরদের 'পীর' হিসাবে আখ্যায়িত করার পেছনে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। পীররা

Linguistics : A Soviet Approach. Ed. by M. S. Andronov & Bhakti P. Mallik. Indian Journal of Linguistics, Calcutta : 1988 Rs. 175·00.

অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী, নভশ্চরের ক্ষেত্রে এই দিক প্রযোজ্য নয়। 'অসপিসিয়াস কোয়েনসিডেন্স' শব্দাংশ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। এই শ্রেণীর সাধারণ বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় এস. এম. আল্লোনভ ও ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের এই সংকলনটি ভাষাতত্ত্বের গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিষয়-বিশ্লেষণের প্রয়োগ-রীতি সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয়ের সুযোগ বর্তমান সংকলনটি প্রসারিত করে দিয়েছে। (সোভিয়েত ভাষাবিজ্ঞানীদের নামের উচ্চারণে বর্তমান সমালোচকের ত্রুটি বিদ্যমান বলে ক্ষমাপ্রার্থী)।

"ইতিহাস জানার আগে ঐতিহাসিককে জানো"

গৌতম নিয়োগী

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস বিষয়ে মধ্যযুগবাসী ভারতীয় মানুষদের এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস-বিদদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং নানা ধরনের রচনাবলী সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে এক অসাধারণ উচ্চাঙ্গের গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন অশীতিপর প্রবীণ বিদগ্ধ বাঙালি ঐতিহাসিক ড. জগদীশনারায়ণ সরকার। বস্তুতপক্ষে, এই বইটি বিহারের পাটনায় কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট -দ্বারা আয়োজিত ষষ্ঠ (২৭-২৮ নভেম্বর, ১৯৮৭) কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল স্মারক বক্তৃতার মার্জিত, পরিশোধিত এবং মুদ্রিত রূপ। বক্তৃতার বিষয় ছিল : "ইতিহাসচর্চা তখন এবং এখন : মধ্যযুগের বিহার"। গ্রন্থের শিরোনামও তাই।

গ্রন্থটির গুণাগুণ আলোচনা করার আগে ইনস্টিটিউট এবং যাঁর নামে সেটি স্থাপিত, সে সম্বন্ধে বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন। ড. কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল ছিলেন প্রাচীন ভারত বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর "হিন্দু পলিটি" গ্রন্থখানি এককালে বিশেষ সমাদৃত ছিল। বিহারের এই ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চা বা হিস্টরিওগ্রাফি বিষয়েও উল্লেখযোগ্য কাজ করে-ছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে বিহার সরকার ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী পাটনাতে কে. সি জয়সওয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন—যার উদ্দেশ্য ইতিহাস গবেষণায়, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে এবং অনুসন্ধানে এবং ইতিহাস-বিষয়ক প্রকাশনায় সাহায্য করা। ১৯৮১ সালে ড. জয়সওয়ালের জন্মশতবর্ষ উৎসবের অঙ্গ হিসেবে গবেষণাকেন্দ্রটি 'কে. পি. জয়সওয়াল স্মারক' বক্তৃতার সূচনা করে এবং অদ্যাবধি তা অব্যাহত। অধ্যাপক জগদীশনারায়ণ সরকার ওই বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। সংস্থার বর্তমান ডিরেক্টর ড. পি. এন. ওঝার তৎপরতায় গ্রন্থটি ষষ্ঠ বক্তৃতারূপে বিহার সরকারের আনুকূল্যে সুশোভনভাবে মুদ্রিত হয়েছে। এবং অত্যল্প দামে।

অধ্যাপক জগদীশনারায়ণ সরকার বর্তমানে ভারতে মধ্যযুগের ভারত বিষয়ে, বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রায়-প্রবীণতম। আর মধ্যযুগের বিহার বিষয়ে তাঁর অধিকার সর্বজনস্বীকৃতই শুধু নয়, অধ্যাপক সরকারের সারস্বত সাধনার সঙ্গে বিহারের যোগও অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গী। আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন এই বাঙালি ঐতিহাসিক তাঁর কৃতিত্বময় ও গৌরবোজ্জ্বল ছাত্রজীবনের সবটা গবেষণা-কাল এবং কার্যপরিধির অর্ধাংশেরও বেশি অতিবাহিত করেছেন বিহারে। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থটির প্রতিটি ছত্রে পাণ্ডিত্যের দীপ্তির সঙ্গে মিশে আছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঞ্চরণ,

Historiography Then and Now : Medieval Bihar. Dr. Jagadish Narayan Sarkar. K. P. Jaiswal Research Institute, Patna. 1989. Rs. 35.

যা ঝলমল করে উঠেছে গভীর অধ্যয়নের ফলে, তিল-তিল করে সংগৃহীত তথ্যের প্রামাণিকতায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জগদীশনারায়ণ সরকারই ছিলেন এই বিষয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের স্নেহধন্য ছাত্র জে. এন. সরকার নাম্বার টু, তাঁর গুরুদেবের মতোই পাটনা কলেজে (এখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপনাই করেন নি, মধ্যযুগের পাটনা সহ বিহারকেও চিনে নিয়েছিলেন। জগদীশ নারায়ণ ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'পাটনা কলেজের ইতিহাস' (ড. জগদীশচন্দ্র ঝা-র সহযোগে) বা "গ্লিমসেস্ অব মিডিয়াভেল বিহার ইকনমি" বইতে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে প্রায় সব বইতেই মধ্য-যুগের বিহার বিষয়ে তাঁর মেধা, অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, সজীব ইতিহাসবোধ এবং পরিশ্রমী পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সমালোচ্য গ্রন্থটি মোট তিনটি অংশে বিভক্ত। আবার প্রথম অংশ ভূমিকাসহ স্বতন্ত্র দুটি অধ্যায়ে, দ্বিতীয় অংশটি একটি বড়ো অধ্যায়ে (যার মধ্যে আবার দুটি আলাদা পর্ব) এবং তৃতীয় অংশটি দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এ ছাড়া আছে আটটি মূল্যবান পরিশিষ্ট, যার মধ্যে আটজন খ্যাতকীর্তি ইতিহাস-বিদের রচনাপঞ্জী বিধৃত। সব মিলে দুশো পৃষ্ঠার বেশি। এই পর্ব-পর্বান্তর বিভক্তিকরণের কারণ জানিয়ে ড. সরকার তাঁর নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধে অত্যন্ত বিনয়ের প্রচেষ্টার উল্লেখ করেছেন এই বলে : এটা যেন শুরু হয়, শেষ প্রচেষ্টা নয়, পূর্ণাঙ্গ কাজও নয়। এই যে অত্যন্ত নীচুগলায় কথা বলা, এই বিনয় স্পষ্টতই পাণ্ডিত্যের সেই লক্ষণ—যা আমাদের দেশে ক্রমশ লুপ্ত হতে বসেছে।

যদিও ড. সরকারের মূল আলোচ্য বিষয় মধ্যযুগের বিহার, কিন্তু তিনি প্রসঙ্গক্রমে নানাযুগের কথাও বলেছেন। যেমন সঙ্গত কারণেই এই বইয়ের প্রথম অংশে সাধারণভাবে যে-কোনো জাতির জীবনে ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব কতখানি তা জানিয়েছেন, এবং প্রাচীন যুগ থেকে অদ্যাবধি ইতিহাসের সংজ্ঞা, বৈচিত্র্য, ইতিহাস-বিষয়ে ধারণার ক্রম-পরিবর্তন, ইতিহাসে যুগ-বিভাগ ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় আলোচনা করেছেন। নিছক রাজকাহিনী কিভাবে জনগণের সার্বিক ইতিহাস হয়ে উঠল প্রকৃত সংজ্ঞায়, তা নিয়ে হয়তো বিরাট বই লেখা যায়, কিন্তু ড. সরকার শুধু তা ছুঁয়ে গেছেন, কারণ তা হত আলাদা কাজ। তিনি জানেন যে, 'Ideas on history have changed from age to age, from century to century and at times from writer to writer. The world has moved away during 4½ milleniums from the theocratic and mythical conception of history in Mesopotamia (c. 2500 BC) to the scientific, humanistic, rational, self-revelatory and interpretative history of the 20th century.' তবু পটভূমি বিস্তৃত করার প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই তিনি প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতে, ইয়োরোপে এবং ভারতের বাইরে নানা ইসলামিক দেশে ইতিহাসচর্চার ধারা সংক্ষেপে আলোচনার সামনে এনেছেন। ইংরিজিতে 'হিস্টরি' কথাটি আসছে গ্রীক 'ইস্তোরিয়া' বা ল্যাটিন 'হিস্টোরিয়া' শব্দ থেকে ; আমাদের দেশে 'ইতিহাস' সংস্কৃত 'ইতি-হ-আস' (এভাবে ঘটেছিল) এবং আরবি 'ইলম্-উল তারিখ'—প্রত্যেকটি ইতিহাসের অন্তর্গত হলেও তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। প্রাচীন গ্রীকো-রোমান ইতিহাসচর্চার সম্প্রসারণ মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্র। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ধারণা মধ্যযুগে অনেক পরিবর্তিত হয়ে যায় আরবি-ফারসি ইতিহাস ঘরানার সংস্পর্শে ও প্রভাবে। এই মিশ্র ইতিহাসচর্চার—অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়ব্যাপী দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত বিবরণ যেহেতু ড. সরকার বেছে

নিয়েছেন, তাই ঐ 'Indo-Islamic historiography'র পটভূমিকারূপে ভারতীয় ইতিহাস ঘরানার (indigenous *Itihasa* tradition) ও ইসলামীয় ঘরানার (Islamic ihstoriography) পরিচয় প্রয়োজন ছিল। ড. সরকার সঠিক কাজ করেছেন। তাঁর এই মন্তব্যও সঠিক যে 'The plethora of chronicles since the advent of the Muslims contrasted with their paucity in the preceding period.' (পৃ ৬)।

মধ্যযুগের ভারতে বা মধ্যযুগের বিহারে ইতিহাসচর্চা কেমন করে গড়ে উঠল, তা দেখাতে গিয়ে ড. সরকার আরবগণের সিন্ধুবিজয় ও ঐ প্রদেশে শাসনকাল এবং অতঃপর সবিস্তারে দিল্লী তথা ভারত-শাসনের সুলতানি (তুর্ক-আফগান) যুগ ও মুঘলযুগ বিশ্লেষণ করেছেন। এই কাজ সহজসাধ্য নয়। প্রায় 'চাচনামা'র সময় থেকে মুদ্রালালের 'তারিখ-ই-শাহ আলম' পর্যন্ত এত বড়ো ক্যানভাসের ছবি আঁকা ড. সরকারের মতো বিশেষজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। তুর্কী-আফগান যুগে ইসলামধর্মাবলম্বী মানুষজনের ভারতে আসার পর ইসলামি-ইতিহাসচর্চার যে প্রভাব ও সংস্পর্শ ভারতে লক্ষ করা যায়, তার মধ্যে ফারসি এবং আরবি, দুই ধারাই ছিল। প্রসঙ্গত জানানো দরকার—ফারসি বা পারসীক ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্য ছিল রাজপরিবারের ইতিহাস, দরবারি ইতিহাস, বংশানুক্রমিক বৃত্তান্ত। আরবি-ইতিহাসচর্চার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি—এখানে ইতিহাস বলতে সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিভিন্ন সংগঠনের ইতিহাস ইত্যাদিও বোঝাত, রাজনৈতিক ইতিহাস তো সঙ্গে ছিলই।

ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ধারার সঙ্গে ইসলামি রীতির ইতিহাসচর্চা যুক্ত হওয়ার পরেই যে ইতিহাস রচনার স্রোত আমাদের দেশে বেগবান হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ড. সরকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুলতানি যুগ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে মুঘল যুগ আলোচনা করে সেই ইতিহাসচর্চার ইতিহাস শুনিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুলতানি আমল এবং তৃতীয় অধ্যায়ে মুঘল আমলে তৎকালীন ইতিহাসচর্চার বিবরণ দিয়েছেন লেখক। তুর্ক-আফগান যুগের ইতিহাসচর্চাকে তিনি ছটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত করেছেন—যথাক্রমে সাধারণ ইতিহাস বা বংশানুক্রমিক ইতিহাস, যেমন মিনহাজউদ্দিন সিরাজের 'তবাকাৎ ই নাসিরি'; উত্তরভারতের আঞ্চলিক ইতিকথা, যেমন ইয়াহিয়াবিন আহমদ সরহিন্দি-র 'তারিখ ই মুবারকশাহী'; রাজপ্রশস্তি (ফাজিল বা মানাকিব), যেমন শামসুদ্দিন সিরাজ আফিজ-এর 'তারিখ ই ফিরুজশাহী'; নীতিশিক্ষামূলক ইতিহাস, যেমন জিয়াউদ্দিন বরণীর 'তারিখ ই ফিরুজশাহী'; পদ্যছন্দে ইতিহাস, যেমন হাসান নিজামীর 'তাজ উল মাসির'; জীবনীমূলক ইতিহাস, যেমন 'ফুতুহাৎ ই ফিরুজশাহী বা 'মালফুজাৎ'-'তাজকিরাট' গুলিও ঐ পর্যায়ভুক্ত। মধ্যযুগে তো আধুনিক বা ব্রিটিশ যুগের ভৌগোলিক ধারণা অনুযায়ী বিহার প্রদেশ গড়ে ওঠে নি, তাই সুলতানি ভারতের পূর্বোক্ত সব কয় ধরনের লেখাই বিহার জানবার জন্য দরকার। ওই যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে হাসান নিজামী (১১৯১-১২২৯), মিনহাজউদদিন সিরাজ (১১৯৩-১২৬৬) বা জিয়াউদ্দিন বরনি (১২৮৫-১৩৫৯) প্রমুখ সম্পর্কে আলোচনা আমাদের মুগ্ধ করে। সুলতানি যুগে ইতিহাস যেখানে রচিত হত মুখ্যত রাজ-শাসকদের ঘিরে, মুঘল যুগে তা অনেক ব্যাপ্ত হয়ে জনগণের দিকেও ইতিহাসবিদদের দৃষ্টি পড়ে। মুঘল যুগে পূর্বোক্ত দু ধরনের ইতিহাস তো ছিলই তার সঙ্গে দরবারি মালমশলা, আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, সরকারি ইতিহাস, বেসরকারি ইতিহাস, সাহিত্যমূলক ইতিহাস প্রভৃতি যুক্ত হয়। যুক্ত হয় 'ইনসা' সাহিত্য বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইতিহাস। এ ছাড়া ভ্রমণ-কথায় ইতিহাস তো ছিলই। আবুল ফজল, খাকি খান, বদায়ুনী, ভীমসেন, ঈশ্বরদাস, কৌশলচাঁদ, নিজামউদ্দিন আহমদ বক্সী, মিরজা নাথান প্রমুখ ঐতিহাসিকদের রচনার বিশদ পরিচয় আমাদের মুঘল যুগ বুঝতে সাহায্য করে।

লেখক অবশ্য স্বতন্ত্র চতুর্থ অধ্যায়ে মধ্যযুগের সমসাময়িক ইতিহাসচর্চার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দোষ-গুণ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস-দর্শন, সূত্রাবলী, রচনা-প্রণালী, নিরপেক্ষতাবোধ ইত্যাদি বিষয় তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী কলমে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ড. সরকারের আলোচ্য মধ্যযুগ সম্বন্ধে আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকদের কাজ যা বিহারের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। আচার্য যদুনাথ সরকার, সুবিমলচন্দ্র সরকার, পাটনা স্কুল অভ রিসার্চ, কালীকিঙ্কর দত্ত, সৈয়দ হাসান আসকারী, হরিরঞ্জন ঘোষাল, স্বয়ং জগদীশনারায়ণ সরকার, ফণীন্দ্রনাথ ওঝা, বিষ্ণু অনুগ্রহ নারায়ণ, ব্রহ্মদেব প্রসাদ অসুস্থ, রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী, কেয়ামুদ্দিন আহমেদ, সুরেন্দ্রগোপাল, রাজীব নইন প্রসাদ, পরমেশ্বর প্রসাদ সিনহা, জটাশঙ্কর ঝা, বিনয়কুমার রায়, জগদীশচন্দ্র ঝা প্রমুখের ইতিহাসচর্চার বিবরণ যেমন তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, তেমনি বিংশ শতাব্দীতে বিহারের নানা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে গবেষণার ধারা গড়ে উঠেছে সে কথাও লিখেছেন। পরিশিষ্টে এঁদের অনেকেরই গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থটি আমাদের আরও অপরিহার্য হয়েছে। বলা বাহুল্য, গ্রন্থটি জগদীশনারায়ণ সরকারের পূর্বে প্রকাশিত *History of History-Writing in Medieval India* নামক গ্রন্থটির উপযুক্ত পরিপূরক। ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড হ্যালেট কার বলেছিলেন, 'ইতিহাস জানার আগে ঐতিহাসিককে জানো।' ড. সরকারের বইটি সেই কাজে আমাদের সহায়ক।

প্রসঙ্গ টলস্টয় এবং কয়েকজন বাঙালি ঔপন্যাসিক

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বাঙলায় টলস্টয়-চর্চার বয়স একশ বছর হল। ১৮৯০ সালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত "সাহিত্য" মাসিকপত্রে এর সূত্রপাত। অবশ্যস্বীকার্য এর কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন সুরেশচন্দ্র। বাঙলায় টলস্টয়-চর্চায় শেষতম সংযোজন শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথের "টলস্টয় জীবন সাহিত্য শিল্পজিজ্ঞাসা"। লেখক টলস্টয়ের জীবনকথা ও সাহিত্যচর্চার বিবরণ দিয়েছেন একটি অধ্যায়ে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৮)। বাকি চারটি অধ্যায়ে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০০) টলস্টয়ের শিল্পজিজ্ঞাসার বিবরণ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তার সঙ্গে তাঁর শিল্পচিন্তার তুলনামূলক বিচার করেছেন। এক্ষেত্রে লেখকের মূল আশ্রয় টলস্টয়ের "হোয়াট ইজ আর্ট" (১৮৯৮), যার প্রথম ইংরেজ অনুবাদ করেছিলেন এলমার মড "হোয়াট ইজ আর্ট অ্যানড এসেজ অন আর্ট" নামে (১৯০০)। শ্রীনাথ ড. হায়াৎ মামুদ-সম্পাদিত "লেভ তলস্তোয়" সংকলন (১৯৮৫, মুক্তধারা, ঢাকা) থেকে পাশ্চাত্য মনীষীদের টলস্টয়-সম্পর্কিত অভিমত যুক্ত করে দিয়েছেন। একটি বিশ পৃষ্ঠার পরিশিষ্টে টলস্টয়ের "অন্ আর্ট" (রচনা ১৮৯৫-৯৭-এর মধ্যে) নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন। উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর আশ্রয় মড-এর বইটি।

টলস্টয় জীবন সাহিত্য শিল্পজিজ্ঞাসা—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। আবাহনী-প্রভা প্রকাশনী। ১১ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। পঁয়ত্রিশ টাকা।

বাংলা উপন্যাসের এক যুগ—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। ওই। তিরিশ টাকা।

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২। সংকলিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্‌যাপন সমিতি। বাঙ্কইপুর। আট টাকা।

স্বীকার্য, শ্রীনাথ গণ্ডুষে সমুদ্রপানের প্রয়াস করেছেন। টলস্টয়ের দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় পরস্পরবিরোধী উত্তাল জীবন এবং তাঁর পরিবর্তনশীল সাহিত্যভাবনার পরিচয় দিতে চেয়েছেন দেড়শ পৃষ্ঠার মধ্যে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, শ্রীঅন্নদাশংকর রায়, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শশিভূষণ দাশগুপ্তের টলস্টয়-চর্চা, যা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ত ও সীমায়িত লক্ষ্যে আবদ্ধ। শ্রীনাথের প্রয়াস —স্বীকার্য অতি সামান্য পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ প্রয়াস —তারিফ করার মতো হলেও টলস্টয়ের শিল্পচিন্তার পরিচায়করূপে খুব-একটা নির্ভরযোগ্য নয়। হয়তো এক নিশ্বাসে সবকিছু জানাবার অভিপ্রায়ে এমনটি ঘটেছে।

টলস্টয়ের জীবনযাত্রা ও শিল্পচিন্তায় পঞ্চাশোর্ধ্বে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। এই ব্যাপারটি এগারোটি বাক্যে ধরেছেন শ্রীঅন্নদাশংকর রায়—

'পঞ্চাশোর্ধ্বে টলস্টয় বনে না গেলেও বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের যৌবনের ভরা গঙ্গা তাঁর অমনোনীত হয়েছিল। সেই ভরা যৌবনের সৃষ্টিকেও তিনি নীতির বিচারে খাটো মনে করতেন। এতে কিন্তু আমার মন সায় দেয় নি। ভালোমন্দের বিবেক তাঁর মতে সমাজের বেলায় যেমন শিল্পের বেলায়ও তেমনি। ভালো কবিতা, ভালো গান, ভালো ছবি, একথা যখন বলব তখন কি এই কারণে বলব যে কবিতাটা বা ছবিটা লোকহিতকর, শিক্ষাপ্রদ, নীতি-সম্মত? মানুষের সহজাত রসবোধ ও রূপবোধকে দমন না করে এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। আর্টের সংজ্ঞাকে সংকুচিত করে তাকে ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রের সীমানার ভিতরে আনতে গেলে যা হয় তা চীনদেশের মহিলাদের লোহার জুতো পরানো। সুন্দরীকে সতী বানানোর এই সাধু অভিপ্রায় আর্টকে এত উচ্চে তুলে নিয়ে যাবে যে তাকে আর্ট বলে চেনা যাবে না। তার চেয়ে হতে দাও না কেন তাকে অসতী। হোক না সে আনা কারেনিনা।' ('টলস্টয়' পরিচ্ছেদ ২, পৃষ্ঠা ৮, ১৩৮৭)।

আফশোসের কথা, শ্রীনাথ টলস্টয়ের শিল্পচিন্তা সম্পর্কে এমন স্পষ্ট করে নিজস্ব মত দেন নি। "হোয়াট ইজ আর্ট" গ্রন্থের অনুবাদ, সারাংশ নিয়েছেন, কিন্তু তার বঙ্গীয় রূপের বিশ্বাস্যতা সম্পর্কে কোনো পাথুরে প্রমাণ দেন নি।

একটিমাত্র উদাহরণ দিই। বাস্তবতা সম্বন্ধে টলস্টয়ের বক্তব্য এমত—বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক হবে এমন যা সকলের মনেই বাস্তবতাবোধকে উদ্বুদ্ধ করে। এই বাস্তবতার অর্থ এই নয়, যা পরিদৃশ্যমান বা প্রত্যক্ষগোচর। শিল্পীর মনে যে জীবনচেতনা সৃষ্টি হয়েছে তাই হল বাস্তবতা।

এইভাবে বাস্তবতা সম্পর্কে টলস্টয়ের অভিমত বাঙলায় পেশ করায় সারাংশদাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এ বিষয়ে নানা সংশয় আর প্রশ্ন থেকে যেতে পারে। সে-কারণেই বাঙলা-লেখকের কর্তব্য মূল (ইংরেজি অনুবাদে) পেশ করা। প্রাসঙ্গিক অংশটি মড-এর অনুবাদে পাদটীকায় উদ্ধার করা উচিত :

'The highest limit of the artist's relation to his subject will be such as evokes in the soul of all men an impression of reality – the reality not so much of what exists, as of what goes on in the soul of artist.' (Tolstoy —'What is Art ?' Tr. by A. Moude).

বাস্তবতা (রিয়লিটি) সম্পর্কে টলস্টয়ের এই ধারণার আলোচনা শ্রীনাথের বইতে পাই নি। কেবল একটি বাক্য আছে – টলস্টয়ের সুচিন্তিত অভিমত— 'বাস্তবতা বস্তুর বহিরঙ্গ-রূপাশ্রয়ী' (পৃ ৬৯)। মড-অনূদিত অংশের অনুল্লেখের ফল রিয়লিটি সম্পর্কে টলস্টয়ের ধারণা থেকে এখানে আমরা বঞ্চিত হই।

তথাপি একথা স্বীকার্য, অল্প জায়গার মধ্যে শ্রীনাথ বিশাল বক্তব্যকে ধরতে চেয়েছেন। বইটির শেষে মুদ্রণ-অশুদ্ধির একটি তালিকা আছে। (তার

বাইরেও আছে বহু মুদ্রণ-প্রমাদ)। এটির চেয়ে পাঠকের কাছে বেশি দরকারি ছিল তিনটি তালিকা : উল্লেখপঞ্জী, নির্মিত পরিভাষা-তালিকা আর গ্রন্থপঞ্জী। আফশোস, তা পাই নি।

শ্রীনাথের দ্বিতীয় বই : "বাংলা উপন্যাসের এক যুগ (১৯৩০-৭০)"। চারটি প্রবন্ধ আছে—তারাশংকর, বনফুল, মনোজ বসু, জরাসন্ধ। 'নিবেদনে' লেখক বলেছেন, সর্বাধিক খ্যাতিমান উপন্যাসলেখক তিন বন্দ্যোপাধ্যায়—তারাশংকর, বিভূতি ও মানিক। এই বইয়ে তিনি প্রথমকে নিয়েছেন, পরবর্তী দুজনকে বাদ দিয়েছেন। গ্রহণ-বর্জনের যুক্তিটা চমকপ্রদ। তারাশংকরকে তিনি নিতে চান নি, কারণ তারাশংকর বহু-আলোচিত; তবু নিয়েছেন, কারণ দেখিয়েছেন 'জীবনের কোন্ দুর্নিবার প্রেরণা তাঁর উপন্যাসকে বিচিত্রধর্মী ও জীবনরহস্য-সচেতন করে তুলেছে, তার সূত্রসন্ধানের চেষ্টা করেছি।' বিভূতিভূষণ ও মানিককে বাদ দিয়েছেন কারণ তাঁরা বহু আলোচিত। শ্রীনাথ আর যে তিনজনকে নিয়েছেন, তাঁরা—বনফুল, মনোজ বসু, জরাসন্ধ। কারণ দর্শিয়েছেন—'তাঁদের ঔপন্যাসিক প্রতিভা সম্পর্কে কোথাও সামগ্রিক আলোচনা হয় নি বলেই আমার বিশ্বাস।'

গ্রহণ-বর্জনের কারণ ও লেখকের বিশ্বাস খুব একটা নির্ভরযোগ্য না হলেও আলোচনায় অগ্রসর হতে বাধা নেই।

উপক্রমণিকায় লেখক জানিয়েছেন, ১৯৩০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত কালবৃত্তকে বাঙলা উপন্যাসের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই অভিমতে ধন্দ লাগে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ১৯৩০-এর পূর্বেই প্রকাশিত, ১৯৭০-এর পরে বেশকিছু গুরুত্ব-পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশিত। এ বইয়ের প্রকাশকাল লিখিত আছে—'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা ১৯৮৯-৯০' (এটিও চমকপ্রদ)। ১৯৯০-এ লেখক বলছেন, ১৯৭০-এ বাংলা উপন্যাসের স্বর্ণযুগ অবসিত। বইয়ের এই পরিকল্পনা ও স্বর্ণযুগ-নির্বাচনে উপন্যাসপাঠক হোঁচট খায়। মনে হয়, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধকে জুড়ে দিয়ে তৈরি হয়েছে বইটি। 'বনফুল' অধ্যায়ের স্পষ্ট দুটি ভাগ। প্রথমটি—বনফুল, দ্বিতীয়টি—বনফুলের উপন্যাসে সমস্যাচেতনা। 'তারাশংকর' অধ্যায়ে পাঁচটি ভাগ : জীবন ও সাহিত্যের প্রেরণা, সাহিত্য ও সমাজভাবনা, তামস তপস্যা, আরোগ্য-নিকেতন, উপন্যাসে শিক্ষা-ভাবনা। হয়তো বিভিন্ন সময়ে লিখিত কয়েকটি নিবন্ধ জুড়ে একটি প্রবন্ধ। "প্রবন্ধ" বলতে বুঝি প্রকৃষ্টবন্ধন। তার অভাবে বইটি ও প্রবন্ধগুলি 'অর্গানিক ইউনিটি' থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কোনো যোগ্য 'এডিটর' যদি ঠিকমত সম্পাদনা করে দিতেন, আরো কিছু গ্রহণ-বর্জন করতেন তাহলে বইটি দাঁড়িয়ে যেত। আলোচ্য সময়-সীমায় লেখক নিতে পারতেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বা নরেন্দ্রনাথ মিত্র বা সুবোধ ঘোষ বা গোপাল হালদার বা বুদ্ধদেব বসু বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে বা অন্নদাশংকর রায়কে। তাঁদের বাদ দিলেন কোন্ যুক্তিতে? উপক্রমণিকায় তিনি এঁদের কয়েকজন সম্পর্কে সামান্য দু-চার কথা লিখে জানিয়েছেন, 'আলোচ্য কালবৃত্তের মধ্যে এ-সমস্ত ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হলেও তাঁদের রচনা বহুকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।' এ মন্তব্য ঠিক নয়। এই সময়-সীমার মধ্যে উল্লিখিত অধিকাংশের জীবনান্ত হয়েছে। তাঁর নির্বাচনের ভিত্তি কী?—উপন্যাসলেখকের জন্ম-বৎসর না, প্রথম ও শেষ উপন্যাসের প্রকাশকাল? অথবা যুগের প্রতিনিধিত্বের দাবি? বা কোনো মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য? উপক্রমণিকায় তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর সহযোগী সমবয়স্ক উপন্যাসলেখকদের নামও করেন নি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে (যিনি বয়সে ঈষৎ বড়ো হয়েও এই গোষ্ঠীভুক্ত) বাদ দিয়েছেন কোন্ যুক্তিতে?

উপন্যাসলেখকের আলোচনা কত পরিকল্পিত হতে পারে তার উদাহরণ তৃতীয় বইটি—বলা উচিত সংকলনটি। নাম "ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২"। বারুইপুরের মানিক জন্মদিবস উদ্‌যাপন সমিতি-প্রকাশিত এই সংকলনটি পড়ে তৃপ্তি পেলাম। আফশোস, প্রথম সংকলনটি পাই নি। আলোচ্যমান সংকলনের পরিকল্পনা স্পষ্ট, রূপায়ণ স্পষ্টতর। প্রকাশক-সম্পাদকবর্গ জানিয়েছেন, এমত সংকলন আরো বের হবে। মানিক-সাহিত্যের শ্রদ্ধাশীল মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সংকলকরা চেয়েছেন মানিকের সাহিত্যের খুব কাছে পৌঁছতে। মানিককে তাঁরা দেখতে চেয়েছেন একজন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে, কথাশিল্পী হিসেবে। জীবনের দ্বন্দ্ব, জটিলতাকে মানিক যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তৎসৃষ্ট চরিত্রগুলির দ্বারা, সেগুলি আজো আমাদের কাছে কতখানি বাস্তব, তা দেখার অভিপ্রায় এই সংকলন-প্রকাশে ক্রিয়াশীল। যুক্তি, বিজ্ঞান-মানসিকতা, রোমানটিকতাবর্জিত বাস্তবতাবোধের দ্বারা মানিক জীবনকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। মানিকের সেই চাওয়া তাঁর গল্প-উপন্যাসে কিভাবে কতটা রূপায়িত, তা দেখার অভিপ্রায় সংকলন-প্রকাশে প্রেরণা জুগিয়েছে।

সন্দেহ নেই, আলোচ্য সংকলন-ধৃত ছটি প্রবন্ধে তার পরিচয় পাই। সুতপা ভট্টাচার্য ("পদ্মাপারের কপিলা"), বীরেন্দ্র চক্রবর্তী ("ঠিকমতো বাঁচতে জানা"), সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ("সময়ের স্বাক্ষর : চিহ্ন"), শংকরকুমার চট্টোপাধ্যায় ("পটভূমি নিঃসঙ্গতা : হেরম্ব শশী রাজকুমার") সৈকত রক্ষিত ("জননীর স্বরূপ"), ছত্রধর দাস ("প্রতিবিম্ব : এক উপলব্ধি"), ছ-জনের ছ-টি প্রবন্ধ। অধিকাংশই প্রায় অচেনা সমালোচক। তাঁদের দৃষ্টি নবীন, মানসিকতা নবীন, উপস্থাপনা নবীন। সবটা মিলিয়ে বাঙলা সাহিত্যসমালোচনায় এক ঝলক নতুন হাওয়া। একটি বা দুটি উপন্যাস ধরে মানিক-প্রতিভার নির্মোহ যুক্তিসিদ্ধ নিরুচ্ছ্বসিত বিচার। উপন্যাস থেকে প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি সামনে ধরে জীবনের শিল্পায়ন মানিক-উপন্যাসের বিচার। জীবনের দ্বন্দ্ব আর জটিলতাসমূহের রূপায়ণ কীভাবে, তার বিচার। এই সংকলন পাঠককে ভবিষ্যতের সংকলনের জন্যে উন্মুখ করে।

ছোটোগল্পের বহতায় বাংলাদেশের কয়েকজন গল্পকার

কান্তি গুপ্ত

ফাতীমা কবীর, তাঁর গল্পগ্রন্থ "স্বপ্নের দিগন্তে একা" উৎসর্গ করেছেন, 'আবহমান বাংলাদেশের মেয়েদের হাতে।' উৎসর্গপত্রে জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হয়েছে, 'এই সমাজে নারী হয়ে জন্মেছি একি আমাদের অপরাধ?' অতঃপর অপর এক পৃষ্ঠায়, অনুমিত হয়, ভূমিকা রূপেই উদ্‌ধৃত হয়েছে, 'আমি নারী আমি মহীয়সী' ইত্যাদি কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। কবীরের গন্থের উৎসর্গ- ও ভূমিকা- পত্রের এসব লেখা, পূর্বিতা রূপে, গল্পকারের অভিপ্রায় সম্পর্কে পাঠকমনে কিঞ্চিৎ আভাস দেয়। উন্নতিকামী দেশের সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত পুরুষশাসিত সমাজ এখনো নারী সম্পর্কে উদাসীন। এখনো নারী অনিবার্যভাবে বয়ে চলেছে অপমান লাঞ্ছনা নিপীড়ন। গভীর সহমর্মিতায় কবীর নয়টি গল্পে নানান উপকরণ সংগ্রহ করে এরকম ভাবনার প্রত্যক্ষ রূপ অভিব্যক্ত করায় সচেষ্ট থেকেছেন। অভীষ্ট পথে নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয় নি কিন্তু রস-সঞ্চারে কবীরের সচেতনতা অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

নারীর নিঃসহায়তা আর নিরুপায়তার ছবি উজ্জ্বল রূপ নিয়েছে "ভাঙ্গনের মুখে" গল্পে। ১৯৪৭-এর পর মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ। পঞ্চান্ন বছরের অছিরন দেখে, নদীর মতো নিঃস্বতা সবকিছুই গ্রাস করে চলেছে বাধা-বন্ধহীন। বিদ্রোহী কন্যা নিশানী আপন ভাগ্য জয় করে নেবার চেতনায় অটুট থাকতে পারে নি। কন্যার জন্যে অন্তঃস্থলে রক্ষিত যে অহঙ্কার মা অছিরনের শেষ সম্বল, তাও সে খুইয়ে বসল। অছিরনের চোখে 'শুধুমাত্র একটি ছবি জেগে রইল। মেজ চৌধুরীর বুকে আবদ্ধ তার মেয়ে নিশানী।' গল্পগঠনে অপটুতা সত্ত্বেও পাঠকচিত্ত আর্দ্র হয়ে ওঠে কবীরের লক্ষ্যভেদী আয়োজনে। "অন্ধকার যাত্রী" গল্পে স্থান নিয়েছে পুরুষশাসিত সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বন্দিনী নারীর নির্মম যন্ত্রণার কাহিনী। আজিমন-এর তৃতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে কলিমুদ্দিনের সঙ্গে। দিনমজুর কলিমুদ্দিন আজিমনকে ঘরে এনেছে, কারণ সুস্পষ্ট: 'দুই মাসের বাচ্চা ফালাইয়া তোমাদের বউ মইরা গেল। কই থাইক্যা দুধ খাওয়াই...। একসেরী দুধের গাই কিনতে লাগে তিন হাজার টাকা। তার চাইতে বিনা খরচে দুধওয়ালা বউ আনলাম।' কিন্তু আজিমনের শেষরক্ষা হল না। প্রাক্তন স্বামীর ঔরসে আপন গর্ভজাত আট মাসের ছেলেকে লুকিয়ে বুকের দুধ খাওয়াতে গিয়ে আবার তাকে তালাকের সম্মুখীন হতে হল। 'আবারও ঘর ভাঙ্গলো আজিমনের'। কিন্তু কবীর এখানে থামেন নি। জননীর যন্ত্রণাকে সঞ্চার করতে সমাপ্তি-অংশে লিখেছেন, 'ওর গর্ভের অন্ধকারে তখন আর একটি প্রাণ জাগছে।' নির্মোহ চিত্তে কবীর ক্লেদাক্ত ভূমি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অবলা পশুর মতো নারীর দুঃখ এখনো বহমান। দুর্ভাগ্যের এই চিত্র অঙ্কনে কবীরের লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি আগামী প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে। "পালা-বদলের পালা"য় সামাজিক অনুশাসনে অনুশাসিত নারীর নিগ্রহের ছবি রূপায়িত হয়েছে ভিন্ন উপকরণের সাহায্যে। জমিলার বিয়ে হয়েছিল দোজবরের সঙ্গে। সতীন-কন্যা আমিনার সঙ্গে তার আড়াআড়ি কম নয়। কিন্তু সে রুখে দাঁড়াল চোদ্দ বছরের আমিনাকে মাঝ-বয়েসী দোজবরের হাতে পাত্রস্থ করার আয়োজনের বিরুদ্ধে। স্বামী জমির মিয়া ফুঁসে উঠল, 'সতীনঝির ভালো তুই সইবি কেমনে? ছোট জাতের মাইয়া-লোক।' সৎ-মা হয়েও নিজের দুর্ভাগ্য থেকে জমিলা যে সতীন-কন্যাকে বাঁচাতে চেয়েছে একথা স্বামী এবং চারপাশের কেউ বোঝার চেষ্টা করল না। 'নীরবে একা দাঁড়িয়ে (জমিলা) দেখলো পাল্কীতে করে আমিনার শ্বশুরবাড়ী চলে যাওয়া।' গল্পগঠনে কবীর শক্তির পরিচয় রেখেছেন। জমিলা চরিত্রের সঙ্কীর্ণতার পাশাপাশি নারীর কল্যাণমূর্তির সম্পৃক্ততা এবং তার অক্ষমতার বেদনা প্রকাশে কবীরের সহমর্মিতা প্রশংসা দাবি করে।

"প্রতিবিম্বে" মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশনা। স্বপ্নে, বিচারদৃশ্যের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়েছে দাম্পত্য জীবনের প্রেম-ভালোবাসায় অস্তিত্বের অনিবার্য বিপন্নতা-প্রসঙ্গ। "বিশুকাকা ও একটি প্রশ্নে" আশ্রয় পেয়েছে নারীর যৌনচেতনার প্রতি সহানুভূতি। বিষয়টি নতুন নয়। পরিবেশনায়ও কবীর সযত্ন দৃষ্টি রক্ষা করতে পারেন নি। ফলে নিছকই গল্প হয়ে রইল। কন্যা রেনুর জবানিতে মিনুর বেদনা প্রকাশের পরিবর্তে, স্বামী আরিফ ও দেবর বিশুর সম্মুখে মিনুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে নর-নারীর মিলনসমস্যা গভীরতর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহন করত। সমাপ্তি অংশে মা-মিনুর জন্য কন্যা রেনুর বিশুকাকার কাছে চিঠি লেখা নেহাতই আবেগ-পীড়িত ব্যাপার। দেহসম্ভোগে নারীর পূর্ণতা নয়, ভালোবাসায়। সমাজ এই ভাবনার স্বীকৃতি দেয় নি, আজন্ম সংস্কার থেকে মুক্তি নিয়ে

স্বপ্নের দিগন্তে একা—ফাতীমা কবীর। বাংলাদেশ গণ-শিক্ষা সমিতি, ঢাকা। ত্রিশ টাকা।

ষোলই ডিসেম্বর ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প—কাজী ফজলুর রহমান। মুক্তধারা, ঢাকা। বত্রিশ টাকা।

প্রতিপক্ষে সেনাপতি—বুলবুল সরওয়ার। সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা। ত্রিশ টাকা।

গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স ও নবিতুনের ভাগ্যচাঁদ—মহীবুল আজিজ। ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কশপ, চট্টগ্রাম। ত্রিশ টাকা।

নারীও তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এখনো সক্ষম হয় নি। সঙ্গোপনে কামনা-বাসনা লুকিয়ে আত্ম-অবদমনের মধ্য দিয়েই মিনুর যে মনের বিকলতা, "বিশুকাকা ও একটি প্রশ্নে" লেখিকা তা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হন নি। অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ দেশে আপন সত্তা, আপন অধিকার সম্পর্কে লোক-সাধারণের ধারণা এখনো অস্পষ্ট। সুতরাং নারীর অধিকার, নারীস্বাধীনতা এসব দেশে কত সীমিত "ফুলবানু যাসনে" গল্পে কবীর তাকেই অভিব্যক্ত করেছেন। উচ্চবর্গীয় ধনী সমাজের আমজাদ হোসেন খানের গৃহিণী মনোয়ারা একদা কাজের মেয়ে ফুলবানুকে লম্পট স্বামীর হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। স্বামী আমজাদ, আপন সামাজিক প্রতিপত্তি বিপন্ন হওয়ার ভয়ে সেদিন স্ত্রী মনোয়ারাকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। ইতিমধ্যে মনোয়ারা রাজনৈতিক নেত্রী এবং সংসদ-সদস্যা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। পরিবর্তিত অবস্থায় স্বীয় শক্তির ভরসায় হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া ফুলবানুকে পতিতালয়ের হীনশ্রী জীবন থেকে মুক্তি দিতে তিনি সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। কিন্তু স্বামীর বিরোধিতায় তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। তিনি আবিষ্কার করলেন, এই সমাজে 'তার স্বাধীনতা শুধু মনোয়ারা বেগমকে ম্যাডাম খান বানাতে পারে', স্বামীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আপন ইচ্ছাকে জয়ী করার সাহস অথবা শক্তি তিনি অর্জন করতে পারেন নি। যদিচ 'ম্যাডাম মনোয়ারা খানে'র পরাভবেই গল্পের সমাপ্তি তথাপি গল্পটির মূল্য বেড়েছে, নিম্নবর্গীয় দরিদ্র 'ফুলবানু'র সংগ্রামী চেতনার আভাসে। কবীরের দৃষ্টির প্রসার সংবর্ধনীয়।

"মীড় গমক মূর্চ্ছনা" গল্পে গল্পকারের আধুনিক হয়ে ওঠার লক্ষণই প্রধান। ধনী ঘরের মেয়ের যথার্থ প্রেমিককে খুঁজে নেবার কাহিনী নেহাতই মামুলি। "বুকের ভিতর বাংলাদেশ" দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শের পরিমণ্ডলে লেখা। মুক্তিযোদ্ধা অর্থের ধান্দায় কালো পথে নেমেছে, মুক্তিযোদ্ধার সম্মানকে মুখোশের মতো এঁটে নব্যরাজাকর বেড়ে উঠছে। সংগ্রামী মানুষের নৈতিক শিথিলতার প্রতি ভ্রূকুটি হেনেছেন কবীর। কিন্তু গল্পগঠনের শৈথিল্য এবং অতিকথনের বিলাসিতা, পাঠকমনে লেখিকার ধ্যান-ধারণাটিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে নি। "স্বপ্নের দিগন্তে একা" গল্পে শ্রমজীবী দম্পতির প্রেম-ভালোবাসার দুর্ভাগা-পরিণতির কথা। কবীরের এই গল্পের কাব্যধর্মী নাম-করণের সঙ্গে লেখন-শৈলীর সম্মিলন ঘটে নি। দুঃখের বিবরণ আছে, সঞ্চার নেই।

'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, / রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।' কবির এই ক্ষোভ বাঙালি দূর করেছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নানে, মৃত্যুকে ভ্রূকুটি হেনে। বাংলাদেশের সাহিত্যসাধকগণ মুক্তিযুদ্ধের কথা বাহিত করেছেন তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং গভীর কবি-কল্পনার সহযোগে। অভিগ্রস্ত স্বদেশভূমি আর স্বদেশ-বাসীর জীবনস্ফূর্তির অভিব্যক্তিতে তাঁদের রসপ্রাণতা এখনো প্রবহমান। ফজলুর রহমানের দশটি গল্পে সংকলিত "ষোলই ডিসেম্বর ও মুক্তিযুদ্ধের গল্প" গ্রন্থ প্রসঙ্গে এসব কথা মনে পড়ে। রহমানের প্রায় সব কটি গল্পই গড়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায়। পাকসেনা, অনুচর রাজাকারদের নির্মম নৃশংস অত্যাচারই একমাত্র বিষয় হয়ে ওঠে নি; তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে সংগ্রামী প্রতিরোধের বৃহৎ বিশ্বাস।

পঁচিশে মার্চ সাতকোটি বাঙালির জয়ের আশ্বাসের সঙ্গে মহিউদ্দীন সম্মিলিত হয়েছিল। সেদিন তার ব্যক্তিগত জীবনেও সম্ভাবনার সূচনা। প্রেয়সী নাজমার পিতাকে জানাবে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথা। পাক সেনার ট্যাঙ্কের শেলে স্তব্ধ হয়ে গেল মহিউদ্দীনের জীবন। এ নিয়ে ডায়েরির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে "পঁচিশে মার্চ" গল্পটি। বিষয়টি রহমানের উপলব্ধির অন্তর্গত। কিন্তু ডায়েরির আনুপূর্বিক উপ-স্থাপনার ত্রুটি পাঠকহৃদয়কে বিমূঢ়তায় স্তব্ধ করে দেয় না। এই ব্যর্থতা কিঞ্চিৎ প্রশমিত "যেখানে

প্রতিরোধ" গল্পে। মুক্তিযুদ্ধে যখন সকল সেপাই থানা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তখন ছোটো দারোগা এনায়েত রয়ে গেল একা, স্ত্রী-পুত্রের ভাবনায় পিছুটানে। রেহাই সে পেল না, কট্টর বদমাশরূপে পাক সেনাদের হাতে নিহত হল নৃশংসভাবে। গল্পটিতে পাক সেনার বর্বরতাই বড়ো হয়ে ওঠে নি। রহমানের ঈষৎ ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে এনায়েতের স্বতন্ত্র দুর্গে থাকার আয়োজনের দিকে। সংগ্রামী অভিযাত্রীদের দুর্জয় প্রাণ-বেগ বাহিত হয়েছে যেসব গল্পে তার মধ্যে অন্যতম "পেছনে ফেরা যায় না।" 'চরকা সাহেব' রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের কালে তিনি আওয়ামি লীগের প্রতি শ্রীতশ্রদ্ধ রাজনীতিসংস্রবশূন্য নিরপেক্ষ ব্যক্তি। পাক অনুচরেরা তাঁকে টেনে নিল শান্তি কমিটিতে। নিরুপায় হয়ে তিনি দেখেন পাক বর্বরতা। নিহত হল ভাতিজা নাজিম। এবার প্রতিরোধের পালা। নিজের জীবন দিয়ে পাক সেনা-দের হত্যা করে 'চরকা সাহেব' নিজেকে জয়ী করে গেলেন। রহমানের অকৃত্রিম বিস্তার বাঙলা সাহিত্যে গল্পটিকে উজ্জ্বল রাখার দাবি করে। "দৃষ্টি পেরিয়ে" গল্পে একটি কিশোরের দুর্জয় সাহসিকতার কাহিনী। নিটোল গল্পের স্বাদগ্রহণ উপস্থাপনার ত্রুটিতে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। "অস্তিত্বে" জীবনের জন্যে জীবনদানের দীপ্তি। অঞ্চলের মুক্তিবাহিনীর নেতা শামসুর শিশুঘাতী নারীঘাতী বর্বর পাক সেনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুকে নিশ্চিন্ত জেনেও শহীদের রক্ত-ঋণ শোধ করতে জীবন সমর্পণ করেছে। শামসুরের এই মৃত্যু স্মরণ করায় কবি মধুসূদনের সেই চিরন্তন পঙ্‌ক্তি :

'রিপুদলবলে চলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শতধিক তারে।'

শান্ত নিরীহ নিরিবাদী জীবনে "পেছনে ফেরা যায় না", "দৃষ্টি পেরিয়ে" "অস্তিত্ব" উষ্ণতার প্রবাহ আনে। বাঙালির গল্পপাঠের ভুবনে এরকম নজির স্বল্প। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত সোবিয়েত রাশিয়ার গল্পে এরকম উষ্ণতার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই উষ্ণ প্রবাহ বহতা থেকেছে "লায়লা আমি ও ভুল" গল্পে। রহমান জয়ী করেছেন স্বদেশভূমির জন্যে শিল্পীর আত্মত্যাগের মহৎ ব্রত। পরিবেশনায় মিতভাষ পাঠক হৃদয়স্পর্শ করে।

"যাত্রী" গল্পে স্থান পেয়েছে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে স্বদেশের জন্য যৌবনের অনুধ্যান। "মুখোমুখি"তে গল্পের আঙ্গিকে রহমান প্রাবন্ধিকের বস্তুগত ভাবনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। উইলফ্রিড ওয়েনের স্ট্রেনজ মিটিং-এর অনুসৃতিতেই পাক যুবক ক্যাপ্টেন এবং মুক্তিবাহিনীর বন্দীর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ এনে রহমান জাতি-বৈরিতার বিরুদ্ধে ভ্রাতৃবোধের গৌরব কীর্তন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের গতি-প্রকৃতির চিত্র। রাশেদের মতোই মুক্তিযোদ্ধারা বীরের রক্ত-স্রোতে, মাতার অশ্রুধারায় প্রত্যূষের স্বপ্ন দেখেছিল। "আজম আলীর প্রস্থান" গল্পটির এই সংকলনগ্রন্থে স্থান পাওয়া কেমন যেন বেমানান ঠেকে। হয়তো রহমান মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী শ্রমজীবী মানুষের নিরুপায়তার বেদনা অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন আজম আলীর ক্রোধের মধ্য দিয়ে। "ষোলই ডিসেম্বর" গল্পে রহমানের সতেজ প্রত্যয় স্থির থাকেনি। গৌরী আত্ম-হননের মধ্য দিয়ে হিন্দু নারীর শুচিতা রক্ষায় যতখানি সচেষ্ট হয়েছে, সমগ্র বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর জয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে নারীর গৌরবগাথা রচনায় ব্যাকুলতা অনুভব করে নি। গৌরীর আত্মহননের উৎসবিচারে পাক বর্বরতায় শিউরে উঠতে হয় বৈকি কিন্তু মানবশক্তির মহিমায় উদ্দীপ্ত হওয়া যায় না। সর্বকালে সকল আক্রান্তদের মৃত্যুঞ্জয়ী শপথ নিয়েই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হয়। সেখানে 'হিন্দু না মুসলিম জিজ্ঞাসে কোন্ জন'? এই ব্যর্থতা "ষোলই ডিসেম্বর" নামাঙ্কিত গল্পটিকে ঐশ্বর্য দান

করে নি।

বুলবুল সরওয়ারের "প্রতিপক্ষে সেনাপতি" গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে তেরোটি গল্প। "বিষণ্ণ দুপুর" নামাঙ্কিত দীর্ঘ গল্প নিয়ে সরওয়ারের যাত্রা শুরু। গল্পকে হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষায় না থেকে সরওয়ার বিবরণের পর বিবরণ দানে আকৃষ্ট হয়েছেন অধিক। ফলে "বিষণ্ণ দুপুরের" কোনো বিষণ্ণতাই পাঠকহৃদয়ে ছাপ রেখে যায় না। বুলবুল সরওয়ারের অন্যান্য গল্পে এরকম লক্ষণই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রচ্ছদপৃষ্ঠা থেকে জানা গেল, লেখক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করেন সব কিছু। নিঃসন্দেহে এই অনুসন্ধানস্পৃহা লেখকের পক্ষে বড়ো গুণ। কিন্তু এই গুণই বৃহৎ দোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন গল্পকার অনুসন্ধানবৃত্তিতেই মগ্ন হয়ে পড়েন। অনুসন্ধানের দ্বারা সংগৃহীত বিষয়ে উপলব্ধি এবং অনুভূতির সংযোগে পাঠকের সমবেদনার অধীনে নিয়ে আসাতেই গল্পকারের বিজয়। লক্ষণীয় যে, সরওয়ার চারদিক থেকে অজস্র উপকরণ সংগ্রহ করেছেন কিন্তু এসব উপকরণ সরওয়ারের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির বাইরে থেকে গেছে। বিশেষ শিল্পসত্তার সক্রিয় বেগ ক্রিয়াবান হয়ে ওঠে নি। এই সংকলন-গ্রন্থের "দূরত্ব" ও "বাঘ" গল্প দুটি সরওয়ারের প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দেয়।

একই অঙ্গে কত বিচিত্র রূপের বিস্ময়। আধুনিক ছোটোগল্পের দিকে দৃষ্টিপাতে এরকম বিস্ময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আপন রুচি-মরজি অনুসারে সকলেই অভিনবত্বের আয়োজনে প্রতিভার বেগ সচল রেখে-দেন। মহীবুল আজীজের "গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স ও নবিতুনের ভাগ্যচাঁদ" গল্পগ্রন্থ পাঠে এসব কথা ভেবে দেখতেই হয়। মহীবুল সমাজ ও মানব-ভাবনার সন্নিহিত থেকে ছোটোগল্পের অভিনব পরিক্রমায় অগ্রসর হয়েছেন। "গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স ও নবিতুনের ভাগ্যচাঁদ" গল্পটি অবলম্বনেই আটটি গল্পে সংকলিত গ্রন্থের নামকরণ করেছেন মহীবুল। গল্পটিতে নবিতুনকে কেন্দ্র করে অভিব্যক্ত হয়েছে সমাজের ধনফীত উচ্চবর্গীয় মানুষদের হৃদয়হীন স্থূল আচরণ, অপরদিকে নিঃসহায় নিরুপায় মানুষদের হীনশ্রী জীবন। গল্পের বিষয় এবং গল্পকারের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু পরিবেশনার নবীনত্বে চমৎকৃতি দান করে। বিষয় ও অভিপ্রায় ভিন্ন পথে মোড় নিয়েছে "দ্বীপবাসীদের গল্প" ও "পুন্নিমা হেয়ার কাটিং সেলুন" গল্পে। তির্যক দৃষ্টি মহীবুলের একটি বিশেষ ভঙ্গি। এই তির্যক ভঙ্গিতে আভাসিত হয়েছে পল্লীর মহাজন-মোড়লদের স্থূল অহমিকা এবং লোকসাধারণের নিরুপায়তা। ভাবের বাষ্পে বিষয়কে আবৃত করায় মহীবুলের অনীহা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে "নৃতাত্ত্বিক", "মঙ চিঙের অলৌকিক অভিজ্ঞতা" এবং "হোমো স্যাপিয়েন্স" গল্পে। কাহিনীবৃত্তের বাইরে আপনাকে আনতে চাওয়ার আয়োজনই বড়ো হয়ে উঠেছে এসব গল্পে। ফলে, নিটোল গল্পের স্বাদ নেই কোথাও। "একটি অদেয় সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে" ও "অপারেশন" গল্প দুটিকে মহীবুলের তির্যক দৃষ্টি ব্যাঙ্গোক্তিতে রূপান্তরিত করেছে!

মহীবুলের লেখায় সর্বত্র সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যঞ্জনা। এই অনুভূতির ব্যঞ্জনা স্পর্শ করার প্রয়াসে, পাঠকচিত্তে মহীবুলের অভিপ্রেত বিষয় সহজ-সঞ্জীবতা লাভ করবে, এমন নয়, কিন্তু বোধের পরিমণ্ডলে যে আনন্দ স্ফূর্তি সেও তো সংবর্ধনার বিষয়!

স্মরণে

প্রফুল্লদার কথা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রফুল্লদা অর্থাৎ প্রফুল্লচন্দ্র সেন সহাশয়ের নাম সংবাদ-পত্রের পাঠক হিসাবে প্রথম যৌবন থেকে জানলেও তাঁর সেবা- এবং ত্যাগমূলক জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে জানলাম সর্বপ্রথম বাঙলায় গান্ধী-সাহিত্য প্রচারের ব্যাপারে আমার গুরুস্থানীয় নির্মলদার (অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু) কাছে। প্রফুল্লদার সেকালের কংগ্রেসের হুগলী-গোষ্ঠীর সহকর্মী ছিলেন নির্মলদা। জামসেদপুরের গ্রামাঞ্চলে গঠনকর্মে রত অবস্থাতেই প্রথম আমি অসহযোগ আন্দোলন-উত্তর কালে সেকালের দুর্গম ম্যালেরিয়া-প্রবণ আরামবাগ অঞ্চলে পরলোকগত ডা. আশুতোষ দাসের সহকর্মী রূপে প্রফুল্লদাদের গান্ধী আদর্শে গ্রামসেবার কাহিনী শুনি, যার জন্য তাঁর নাম "আরামবাগের গান্ধী" হয়ে যায়।

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে—যখন আমি খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের কর্মী হয়ে কলকাতায় আসি। প্রথম পরিচয়ের ইতিহাস একটু বিচিত্র। অগস্টের মাঝামাঝি কমিশনের কলকাতার দপ্তরের দায়িত্ব নেবার এক দিন পর রাজ্য খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীমতী প্রতিমা বসুর (অচিরাৎ যিনি প্রতিমাদি হয়ে তাঁর স্নেহ আর ভালোবাসায় আমাকে সিক্ত করে জ্যেষ্ঠ সহোদরার স্থান নেন এবং আমৃত্যু যিনি আমার একান্ত আপন-জন এবং শুভার্থী ছিলেন) সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাই। কারণ ভারত সরকারের আমাদের ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যসরকারের খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের কাজেকর্মে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকত। প্রথম সৌজন্য-মূলক সাক্ষাৎকারের স্বাভাবিক সময় দশ-পনেরো মিনিট কেটে যাবার পরও দেখলাম প্রতিমাদি আমার অতীত কর্মজীবন সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছেন। একটু বিস্মিত হলেও আমি তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে চলেছি এবং জানিয়েছি যে ১৯৫১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে গান্ধীজীর চরখা সঙ্ঘের (যা পরে সর্বসেবা সঙ্ঘে রূপায়িত হয়) কর্মী হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেছে—আমি আর কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান করি নি। আধ ঘণ্টার মতো প্রশ্নোত্তরের পালা চলার পর প্রতিমাদি চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, চলুন (এই দূরত্বের সম্বোধন মাস দুয়েকের মধ্যে ছোটো ভাইয়ের সম্বোধন তুমি ও মাঝে-মাঝে তুই-এ পরিণত হয়। প্রতিমাদির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিষণ্ণ চিত্তে মনে পড়ছে) প্রফুল্লদার কাছে যাওয়া যাক—খুব জরুরি।

তিনি তখন বিধানবাবুর মন্ত্রিসভার দুই নম্বর সদস্য। এ ছাড়া, খাদি-গ্রামোদ্যোগসহ তাবৎ গঠন-কর্মে তাঁর নিষ্ঠার কথা তো জানতামই। সুতরাং তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হবে—এ তো সৌভাগ্য। রাইটার্সে প্রতিমাদির অবারিত দ্বার। তাঁর পিছু-পিছু আমিও প্রফুল্লদার কামরায় ঢুকলাম।

প্রফুল্লদা সামনের কাগজপত্র থেকে মুখ তুলতেই বিব্রত কণ্ঠে প্রতিমাদি বললেন, বড়ো ভুল হয়ে গেছে, প্রফুল্লদা, এ তো পি. এস. পি.-র লোক নয়—একেবারে খাদিওয়ালা।

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং আমি। কিন্তু আমিও ব্যাপারটার আদি-অন্ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রফুল্লদাও বেশ বিব্রতভাবে বললেন, কিন্তু—বলল যে।

অনুল্লিখিত নামটা কলকাতায় খাদির কাজের সঙ্গে যুক্ত একজন বিশিষ্ট কর্মীর। মূলত, পশ্চিমবঙ্গের বাইরের কর্মী হবার জন্য এবং প্রথম দীর্ঘমেয়াদে এ রাজ্যে কাজ করতে আসার জন্য আমার সহায়ক হবেন ভেবে উত্তর প্রদেশের শ্রীগান্ধী আশ্রমের জনৈক প্রবীণ কর্মী তাঁর কাছেই আমাকে পরিচয়পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন।

প্রতিমাদি তখন প্রফুল্লদাকে বললেন, তাহলে এখনই আপনার নামে একটা তার পাঠিয়ে দিন খাদি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে যে এর আগের তার অনুসারে শৈলেশকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার দরকার নেই। ও এখানেই কাজ করুক।

তাই করো, তারের খসড়াটা লিখে ফেলো। প্রতিমাদিকে আদেশ দিয়ে প্রফুল্লদা আবার অনুযোগ-ভরা কণ্ঠে বললেন,—এসে বলায় এই তার পাঠালাম। দেখো তো কাণ্ড!

প্রফুল্লদার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের প্রথম পর্ব ওই-টুকুই।

এবারে ভিতরের কথা—ফিরে যাবার পথে প্রতিমাদি যা জানালেন। তখন পশ্চিমবঙ্গে গঠন-কর্মীদের মধ্যে দুটি প্রধান ধারা। একদল প্রফুল্লদা, প্রতিমাদি, পঞ্চাননদা এবং যাঁর নাম অনুক্ত রইল তাঁদের মতো কংগ্রেস-ঘেঁসা। অন্যদল রাজনৈতিক ভাবে প্রজা-সোশালিস্ট পার্টির সমর্থক হয়ে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে থাকলেও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, ডা. নৃপেন বসু, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতো আরও অনেক সরকার ও সরকারি দলের বাইরে সুযোগ্য কর্মীদের সক্রিয় কর্মসাধনায় অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী। কংগ্রেস-সমর্থক গঠনকর্মীরা তাই চান না যে পি. এস. পি. ঘেঁসা কর্মীরা আরও প্রভাবশালী হোন। খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের পশ্চিমবঙ্গ দপ্তরের কর্ণধার রূপে আমি যাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিলাম, তিনি বদলি হয়ে বোম্বেতে এর সদর দপ্তরে যেতে চান না। তাই প্রফুল্লদার ঘনিষ্ঠ ওই নাম-অনুল্লিখিত কর্মীটির সাহায্যে তাঁকে বোঝান যে আমি কলকাতায় থাকলে অপর পক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা করব এবং আমাকে এখানে থাকতে না দেওয়াই ভালো। সুতরাং খাদি কমিশনের চেয়ারম্যান বৈকুণ্ঠলাল মেহতার কাছে প্রফুল্লদার পূর্বোক্ত তার, এবং প্রতিমাদির হস্তক্ষেপে দ্বিতীয় তার।

প্রফুল্লদার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়টা একটু বিব্রতকর পরিস্থিতিতে হলেও সেই দিন থেকেই তাঁর স্নেহবলয়ের অন্তর্ভুক্ত হলাম। অবশ্য এ ব্যাপারে দুইজনের সস্নেহ পৃষ্ঠপোষকতা আমার প্রবল সহায়ক হয়। প্রথম জন, বলাই বাহুল্য, প্রতিমাদি যিনি আমাকে আমৃত্যু ছোটো ভাইয়ের স্নেহদৃষ্টিতে দেখে এসেছেন। দ্বিতীয় জন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রফুল্লদার সচিব—শ্রীযুক্ত সুধীরমাধব বোস, যাঁর স্নেহ আর আশীর্বাদে এখনও পরিপ্লুত হবার সৌভাগ্য লাভ করি। এত উচ্চ পদে আসীন এবং শতবিধ দায়িত্বশীল কাজে ব্যাপৃত থেকেও এমন সহৃদয়, স্নেহশীল এবং ধীর স্থির আদর্শবাদী মানুষ আমি দেখি নি বললেই চলে। প্রফুল্লদা মুখ্যমন্ত্রী হলেও শ্রদ্ধেয় বোস সাহেবের দৌলতে তাঁর কাছে আমার অবারিত দ্বার ছিল।

আর আমার কাজের জন্যও প্রফুল্লদার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ত। পশ্চিমবঙ্গে গান্ধীপন্থায় গঠনকর্মের একজন অন্যতম সহায়ক এবং পৃষ্ঠপোষক রূপেই নয়, ১৯৬৭ খ্রী পর্যন্ত খাদির প্রমাণপত্র সমিতির সভাপতি (পদাধিকারবলে আমি যার সম্পাদক), প্রতিমাদির পর রাজ্যের খাদি-বোর্ডের সভাপতি (পদাধিকারবলে আমি যার বিশেষ আমন্ত্রিত এবং প্রতিমাদি ও প্রফুল্লদার ইচ্ছায় প্রায় ষোলো মাস আমি যার অতিরিক্ত প্রশাসনিক অধিকারী ছিলাম) হিসাবে আমাকে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে হত। এই নিয়মিত যোগাযোগের ফলে আমি তাঁর কাছের মানুষ হয়ে গেলাম, এবং তিনিও পশ্চিমবঙ্গে আমার অভিভাবকের স্থান নিলেন।

প্রায় ত্রিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অনেক মধুর স্মৃতির কথাই মনে পড়ছে, যার কয়েকটির কথাই কেবল উল্লেখ করা সম্ভব।

"তাঁতশিল্প" সম্বন্ধে একটি বেতার-কথিকাতে অনভিজ্ঞতার কারণে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটি বহুলপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। শব্দটির যে স্থানীয় একটা অসম্মানজনক অর্থ আছে, তা আমার জানা ছিল না। এমনকী আকাশবাণীর সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, যিনি আমার মতো বিহারী-বাঙালি নন, ষোলো আনা বাঙালি—শব্দটি তাঁরও নজর এড়িয়ে যায়। কথিকাটি প্রচারিত হবার পরই কেবল আকাশবাণীর দপ্তরেই নয়, সংবাদপত্রেও একাধিক পত্র প্রকাশিত হল আমার বিরুদ্ধে। আকাশবাণীর কর্মকর্তা বিব্রতভাবে বললেন, এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, মশাই। চলন্তিকা আর জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে দেখলাম শব্দটির কোনো অসম্মানজনক অর্থ নেই। তবু আরও জোরালো সমর্থনের জন্য আমাদের এনসাইক্লোপিডিস্ট-স্বরূপ নির্মলদার দ্বারস্থ হলাম। তিনি তখন অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অভ ইনডিয়ার ডিরেক্টার। তিনি চিরকালের অধ্যাপক। তাই তৈরি সমাধান না দিয়ে গ্রীয়ারসন রিপোর্ট দেখিয়ে দিয়ে বললেন, খুঁজে নাও। দিন দুই সেই বিপুল জ্ঞানসমুদ্রে ডুব দিতে-দিতে অবশেষে শুক্তি মিলল। গ্রীয়ারসনও শব্দটির কোনো অসম্মানজনক অর্থের উল্লেখ করেন নি। সেই অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে আকাশবাণীর চিঠির উত্তর দিলাম, বিভাগীয় কর্মকর্তার জান বাঁচল। কিন্তু আমার তো তবুও নিষ্কৃতি নেই। বোসসাহেবের কাছ থেকে এত্তেলা এল—প্রফুল্লদা দেখা করতে চান। সাধারণত আমিই দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করি বলে তার বিপরীত ব্যাপার দেখে দুরুদুরু চিত্তে বোসসাহেবের কাছে হাজির হলাম। উনি জনৈক ভূতপূর্ব মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের প্রবীণ কংগ্রেসী নেতার প্রফুল্লদাকে লেখা চিঠি দেখতে দিলেন। আমার বেতার-কথিকার ওই শব্দটিকে নিয়ে রাজবংশী সমাজে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে আমার প্রতি কঠোর শাস্তি-বিধান করা হোক—এই তাঁর দাবি। একেবারে রাজনৈতিক সঙ্কট! তাই প্রায় ফাঁসির আসামির মতো প্রফুল্লদার সামনে হাজির হলাম। একটু হেসে তিনি সমস্ত ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। সব শুনে বললেন, বাপু হে! বিহারের বাঙালি বলে তুমি জান না যে শব্দটার একটা স্থানীয় অশিষ্ট অর্থ আছে। তা, এক কাজ করো। তুমি আমার কাছে তোমার এইসব কথা জানিয়ে একটা চিঠি লেখো এবং তাতে এও লেখো যে তোমার জানা না থাকার ফলে ওই শব্দব্যবহারে যাঁদের মনে আঘাত লেগেছে তার জন্য তুমি দুঃখিত। অবশেষে ওইরকম একটি চিঠি লিখে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল, যদিও জানি যে ওই রাজনৈতিক সঙ্কট মেটাতে প্রফুল্লদাকে নিশ্চয় বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লদার একাধিক যাত্রাকালে তাঁর সঙ্গী হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। পদযাত্রী বিনোবাজীকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ফেরত রাধিকাপুরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ফেরার পথে মালদার সার্কিট হাউসে আমাদের সবার খাবার ব্যবস্থা প্রফুল্লদা তদারক করছিলেন গৃহ-কর্তার মতো। আর কারো খেয়াল না হলেও ওঁর নজর এড়ায় নি যে "জনসেবক" পত্রিকার তরুণ রিপোর্টারটি খেতে বসেন নি। তাঁর তাগাদায় লোক ছুটল তাঁকেও খাবার টেবিলে নিয়ে আসতে।

এ জাতীয় একটি ঘটনা ঘটে মায়াপুরে। আরামবাগে প্রফুল্লদার ওই কর্মক্ষেত্রে সে বছর শীত-কালে প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মী-সম্মেলন। সেই অবসরে খাদি বোর্ড থেকে আমরা খাদি-গ্রামোদ্যোগের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি মায়াপুরে। হঠাৎ জাঁকিয়ে

ঠাণ্ডা পড়েছিল। তারই মধ্যে প্রফুল্লদা সকালে স্নানাদি সেরে তৈরি হয়ে বাঁশ-খড় দিয়ে তৈরি কর্মী-শিবিরে ঘুরে-ঘুরে সবার সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নিচ্ছিলেন। এই সূত্রে প্রদর্শনীতে আমাদের কার্টুনি-তাঁতি আর অন্যান্য শিল্পীদেরও দেখতে এলেন। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও ঘুরছি। গ্রামের কার্টুনি বা অন্য শিল্পীদের আর কত গরম জামা-কাপড় থাকতে পারে। তার উপর হঠাৎ ওই শীত। প্রশ্নের উত্তরে দুই-একজন তাঁকে বলেই ফেললেন যে শীতে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা। প্রফুল্লদা আমাদের হুকুম করলেন—সবাইকে এক-একখানা খাদি উলের কম্বল দাও। তিনি তো বলে চলে গেলেন। তারপরই কার্টুনি-তাঁতিদের চাপ। কিন্তু আমরা দিই কোথা থেকে? খাদি বোর্ডের দোকানে যে কম্বল তা বিক্রির জন্য। তা দান-খাতে গেলে হিসাব মেলানো হবে কী করে? কিন্তু তাঁর প্রকাশ্য আদেশ তো অমান্য করা যায় না। তাই গ্রামের জন্য ৬০-৭০ মহিলা আর শিল্পীদের কম্বল দিয়ে খরচটা প্রফুল্লদার নামেই লেখা হল। এ বাবদ বোর্ডের (তিনি যার চেয়ারম্যান) প্রাপ্য বেশ কয়েক হাজার টাকা প্রফুল্লদা নিজে দিয়েছিলেন।

প্রফুল্লদার কাছ থেকে প্রশাসনের ব্যাপারেও অনেক শিক্ষা পেয়েছি, যা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। এর দুটি কাহিনী বলি—একটি কৌতুকের এবং অপরটি শেকসপীয়রের ভাষায় justice tempered with mercy.

আমার দপ্তরে কয়েকটি কেরানির চাকরি খালি হয়েছে। নিয়মমাফিক দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। তারপর টাইপের পরীক্ষা এবং ইনটারভিউ ইত্যাদির পর যোগ্যতম প্রার্থী নির্বাচনের ব্যবস্থা করছি। এমন সময়ে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত জনৈক মহিলা একটি তরুণীকে আমার কাছে নিয়ে এলেন। তিনিও আমাদের কাছে দরখাস্ত করেছেন এবং দরখাস্তের একটি নকলে প্রফুল্লদাকে নিয়ে তাঁর মুক্তোর মতো গোটা-গোটা হাতের লেখায় আমার নাম লিখিয়ে নেবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সুপারিশ—'এর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কোরো' লিখিয়ে তাঁর সই করিয়ে এনেছেন। কংগ্রেসের মহিলা কর্মীটি উপরন্তু হিসাবে যোগ করলেন যে প্রফুল্লদা বলে দিয়েছেন যে তরুণীটিকে যেন চাকরি দিই। আমি তো ভিতরে-ভিতরে প্রমাদ গুনলাম। যোগ্যতার পরীক্ষায় চাকরি পাবার উপযুক্ত বিবেচিত না হলে কেবল সুপারিশে কাজ দেওয়ার আমি বিরোধী নীতিগত কারণে। অন্য দিকে যে-সে ব্যক্তি নন—স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এবং আমার একান্ত শুভার্থীর স্বহস্তলিখিত সুপারিশ! আমার সামনে ধর্মসঙ্কট। অনেক ভেবেচিন্তে বোসসাহেবের বদান্যতায় প্রফুল্লদার সঙ্গে রাইটার্সেই দেখা করার একটু সময় জোগাড় করলাম। তারপর দুরু-দুরু-কম্পিত বক্ষে তাঁকে নিবেদন করলাম, আপনি তো মেয়েটিকে কাজ দিতে লিখেছেন। কিন্তু আমাদের তো প্রার্থী নির্বাচনের একটা পদ্ধতি আছে। প্রথমে···। বাধা দিয়ে প্রফুল্লদা বললেন, কই দেখি, কী লিখেছি আমি। তাঁর সুপারিশ সহ দরখাস্তের নকলটি হাতে দিতে দেখে সেকেনড চোখ বোলানোর পর তিনি হেসে উঠলেন। তারপর হাসতে-হাসতেই যোগ করলেন, দেখো হে! আমরা হলাম পাবলিকম্যান। আমাদের কাছে লোকে নানা আবেদন-নিবেদন নিয়ে আসে। তাদের অসন্তুষ্ট করলে আমাদের চলে না। তাই এরকম লিখতে হয়। এর কোনো মূল্য দিও না। তুমি তোমার নিয়মেই চলো। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন।

আমার এক অধস্তন কর্মীর একটি দুর্নীতি হাতে-নাতে ধরা পড়ে। এর জন্য তাঁকে বরখাস্ত করা চলে এবং অপর কর্মীদের কাছে উদাহরণ পেশ করার জন্য বরখাস্ত করা উচিতও। তবু যখন হাতেনাতে প্রথম বার ধরা পড়েছে তখন বরখাস্তের নীচেই যে শাস্তি—তিন বছর বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গে লিখিত ভাবে হুঁশিয়ারি দিতে আমি প্রস্তুত যদি তিনি দোষ স্বীকার করে লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সে কথা আমি তাঁকে জানিয়েও দিলাম। আর এও বললাম

যে দোষ স্বীকার না করলে আমি তাঁকে চূড়ান্ত শাস্তি দিতে বাধ্য হব। ভদ্রলোক হুগলী জেলার স্বাধীনতা-আন্দোলনে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছিলেন, জেলও খেটেছিলেন। প্রফুল্লদা তখন আর মুখ্যমন্ত্রী নন। একদিন ফোনে তাঁর আহ্বান পেলাম। ওই ভদ্রলোকের ব্যাপার জানতে চান। আমি ফাইলটি নিয়ে (যাতে দুর্নীতিরসাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল) তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। কাগজপত্র সব দেখালাম। সব বোঝার পর প্রফুল্লদার মুখমণ্ডল বেদনার্ত হয়ে উঠল। করুণ কণ্ঠে বললেন,—আমাদের এত দিনের কর্মী, সে এমন কাজ করল! আমি নীরবে বসে রইলাম। তারপর তিনি বললেন, দেখো, ওকে তুমিও তো বরখাস্ত করতে চাও না। তাহলে ওর কাছ থেকে লিখিতভাবে দোষ স্বীকার করাতে চাও কেন? তুমি তো চিরকাল এখানে এই পদে থাকবে না। অথচ ফাইলে কাগজটি থেকে যাবে। পরে কেউ ওর ক্ষতি করতে চাইলে ওই স্বীকৃতির বলে ওকে বরখাস্ত করতে পারবে—তুমি ওর বার্ষিক বেতন-বৃদ্ধি বন্ধ করা বা অন্য শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও। তাই এক্ষেত্রে যা করা উচিত তা হল এই যে, তোমার কৈফিয়ত-তলব-করা চিঠির উত্তরে নিজের সমর্থনে যা হয় লিখুক। তুমি ফাইলে লিখে রাখো যে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ওর কৈফিয়ত অগ্রাহ্য করা হল এবং সেই কারণে তুমি যা শাস্তি দেবার কথা ভেবেছ তা-ই দাও। ওঁর পরামর্শের যৌক্তিকতা স্বীকার করে আমি তদনুসারে কাজ করলাম।

কর্মীদের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা তাঁদের পরিবার এবং পুত্র-পরিজনের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ত, এমন অজস্র উদাহরণ দেখেছি। কোনো সহকর্মী কবে গতাসু হয়েছেন। কিন্তু প্রয়োজনে পড়ে তাঁর পুত্র-কন্যা এবং এমনকী নাতি-নাতনিরা প্রফুল্লদার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েছেন—এমন অনেক উদাহরণ দেখেছি। তিনি যখন আর ক্ষমতায় নেই, শুধু নামে কাটছেন, তখনও এরকম কত অর্থী-প্রার্থী তাঁর কাছে আসতেন। তরুণতর কর্মীদের উৎসাহ দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। নকশালি আন্দোলনের রক্তাক্ত দিনের ঘটনা। বন্ধুবর দীনেশ মুখোপাধ্যায়ের হুগলী থেকে কলকাতার সফল শান্তিযাত্রার পর হিংসা আর ভয়ের প্রকোপে পর্যুদস্ত কলকাতায় শান্তি ও অভীঃ মন্ত্র প্রচারের জন্য গান্ধীপন্থী কর্মীদের পদযাত্রা চলছে পাড়ায়-পাড়ায়। আরও কয়েকজন কিশোরীর সঙ্গে আমার বড়ো মেয়েও সেই পদযাত্রী-দলে। পাড়ায়-পাড়ায় শান্তি, অহিংসা আর নির্ভয়তার বাণী প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে তারা (এবং আরও অনেকে) গোল পার্কে নকশালপন্থীদের দ্বারা বিবেকানন্দের মূর্তিকে বিকৃত করার প্রতিবাদে অনশন করছে। প্রফুল্লদাও অনশনকারীদের সমর্থন জানাতে গেছেন। উপবাসরত কয়েকটি কিশোরীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রফুল্লদা তাদের সঙ্গে গল্পচ্ছলে তাদের পরিচয় নিচ্ছেন। আমার বড়ো মেয়ে ভাস্বতী নিজের পিতৃপরিচয় দিতে না দিতেই প্রফুল্লদা হেসে বলে উঠলেন, ও আর বলতে হবে না। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি কার মেয়ে তুমি। ঘটনাটা ওর জীবনের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে গেল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধী হলেও উপযুক্ত মান-মর্যাদা দিতে তিনি সদাপ্রস্তুত ছিলেন। ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (যাঁর স্নেহচ্ছায়া পাবার সৌভাগ্যও আমার হয়) দীর্ঘদিন বিধানসভা ও তার বাইরে প্রফুল্লদাদের দলের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রফুল্লদার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অগ্রজ-অনুজের। মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় ড. ঘোষের বাড়বাসুদেবপুরের প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করতে বা সেখানে গিয়ে সেখানকার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে তাঁর সমান উৎসাহ দেখেছি। অভয় আশ্রমের নৃপেনদা (ডা. নৃপেন বসুও রাজনীতি এবং গঠনকর্মের ক্ষেত্রে তাঁদের হুগলী-গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রফুল্লদা তাঁকে ২৬শে জানুয়ারি পদ্মভূষণ বা পদ্ম-বিভূষণ (ঠিক মনে পড়ছে না) দেবার সুপারিশ করেন ভারত সরকারকে। সরকার সে প্রস্তাব

স্বীকারও করে। খাদি বোর্ডের অতিরিক্ত প্রশাসনিক অধিকারী হিসাবে সে ফাইলের কাজ তাঁর নির্দেশে আমিই করেছিলাম। নৃপেনদা সে সম্মান সৌজন্য-সহকারে অস্বীকার করেছিলেন—সে ভিন্ন কথা। কারণ ইতিমধ্যে সরকারিভাবে উপাধি দেবার কথা ঘোষণা করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি নেবার প্রথা সরকার প্রবর্তন করেছে। খাদি বোর্ডের তরফ থেকে ভারত সরকারের এই ইচ্ছার কথা নৃপেনদাকে জানাতে তিনি বিনম্রভাবে প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কারণ তাঁর মতে গান্ধীপন্থায় অনাসক্ত জন-সেবার সঙ্গে এ জাতীয় সরকারি সম্মান-সংবর্ধনা খাপ খায় না। প্রফুল্লদা এবং নৃপেনদার চারিত্র-মাহাত্ম্যের এই সংবাদ খুব বেশি লোকের জানা নেই বলে এই অবসরে নিবেদন করলাম।

প্রফুল্লদাকে মন্ত্রিসভার দুই নম্বর সদস্য থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং তারপর একেবারে সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখেছি। রাজভবনের বাড়ি থেকে মিডলটন স্ট্রীটের সেই ছোটো ফ্ল্যাট—সর্বত্র একরকম, অনা-সক্ত, নির্বিকার। সাধারণ মানুষ হিসেবে তাঁর এক জন্মদিনের বিকেলের কাহিনী দিয়ে এই শ্রদ্ধানিবেদন-পর্বের উপসংহার করি। সকাল বেলায় অনেকের ভিড় এড়িয়ে একান্তে প্রণাম জানানোর জন্য বিকেলে গেছি। অপর যিনি তখন উপস্থিত ছিলেন, তিনি হলেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্তী। তাঁকে একাধিক বার বলতে শুনেছি যে সাধারণ মানুষ হবার পর তিনি প্রফুল্লদাকে আরও বেশি সম্মান করেন, সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে যান। আমরা জানি যে বামদলগুলির সুদক্ষ প্রচারযন্ত্র প্রফুল্লদার তথাকথিত দুর্নীতির ব্যাপারে কী মিথ্যা প্রচারই না করেছে। স্টিফেন হাউস এবং আরও কোন্ কোন্ সম্পত্তি প্রফুল্লদা মন্ত্রী থাকার সুযোগে করেছেন। অথচ তাঁর এক রাজনৈতিক অনুজ শ্রীযুক্ত অশোককৃষ্ণ দত্ত মহাশয় মুখ্যমন্ত্রিত্ব যাবার পর ওই ফ্ল্যাটে তাঁকে থাকতে না দিলে প্রফুল্লদার কলকাতায় থাকার না স্থান ছিল, না ছিল সঙ্গতি। যাই হোক, সেখানে গিয়ে জন্মদিনের প্রণাম জানাবার পর মধুসূদনবাবু তো চায়ে আপ্যায়িত হলেন। এদিকে আমি চা খাই না। আমাকে কী দিয়ে আপ্যায়িত করেন প্রফুল্লদা? নিজেই ছোটো রান্নাঘরটির এ কৌটো সে কৌটো হাতড়াতে লাগলেন। তারপর অমূল্য সম্পদ আবিষ্কার করার মতো হর্ষ-সহকারে বললেন, এই—এই তো, এতে নেড়ে বিস্কুট আছে। এতে তো তোমার আপত্তি নেই?

আপত্তি? আমি পরম শ্রদ্ধাভরে সেই স্নেহের উপহার মনে-মনে মাথায় ঠেকালাম এবং তারপর উৎফুল্লবদনে চর্বণে রত হলাম। তাতে তখন তাঁর এক কালের রাজভবনের বাড়ির ফ্রিজ থেকে বার করে দেওয়া দামি-দামি সন্দেশ-রসগোল্লার চেয়েও মধুর স্বাদ।

বিদেশী সাহিত্য

অক্টাভিয়ো পাৎস : ভাবনাসূত্র ও কয়েকটি কবিতা

কমলেশ চক্রবর্তী

অক্টাভিয়ো পাৎস তাঁর দীর্ঘ জীবনের নানা সময়ে বিভিন্ন রচনায় এমন সব ভাবনাসূত্র লিপিবদ্ধ করেছেন যা নিশ্চিতরূপে তাঁর পাঠকদের দীর্ঘকাল প্রভাবিত করবে। পাৎসকে তাই তাঁর সমকালেই একজন প্রগাঢ় ধ্যানময় কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং তাঁর ধ্যানের অন্যতম বিষয় হয়ে আছে স্বদেশ, মেক্সিকো ও কাব্যশরীর। তাঁর প্রথম প্রেম, প্রথম ধ্যান, মেক্সিকো বিষয়ে এক প্রবন্ধে লিখছেন :

'আমরা, লাতিন আমেরিকানরা, বস্তুত ইতিহাসের শহরতলীর, মফস্বলের বাসিন্দে। অনিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমরা পশ্চিম দেশের খিড়কি দরজা দিয়ে তাদের আঙিনায় প্রবেশ করেছি। আমরা যখন অনধিকারে প্রবেশ করেছি তখন কিন্তু আধুনিকতার চমকপ্রদ কাণ্ডকারখানা পরিদর্শনের প্রয়োজনে প্রজ্বলিত সবগুলো বাতিই নিভন্ত। অর্থাৎ আমরা যেখানেই গিয়েছি—গিয়েছি অত্যন্ত বিলম্ব করে। আসলে আমরা যখন জন্মালাম তখনই ইতিহাসের অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কোনো অতীত নেই, অথবা যদি বা কিছু থেকেই থাকে, আমরা তার ভগ্নদশার মুখমণ্ডলে অনেক দিন পূর্বেই নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করেছিলাম। আমাদের সমস্ত জাতটা এক শতকের জন্য নিদ্রা গিয়েছিল। আর যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম তখনি হয়েছিলাম লুণ্ঠিত সর্বস্বান্ত। ফলে এখনও আমাদের ছিন্ন কন্থাই সম্বল। স্পেনীয়রা যা রেখে গিয়েছিল আমরা তাও যত্নে রাখি নি। একে অন্যের উদরে ছুরি চালিয়ে আমাদের কালাতিপাত হয়েছে। তথাপি যাকে আধুনিক যুগ বলে অভিহিত করা হয়, অর্থাৎ গত শতকের শেষ থেকে শুরু করে নিয়মিত ভাবনাচিন্তার বিরোধী এই ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করেছেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুল্য কবি, গদ্যরচয়িতা ও চিত্রশিল্পীরা।'

এই মায়াঞ্জনমাখা স্বদেশপ্রেম অত্যন্ত দুর্লভ।

আর্জেনটিনার পুরোধা লেখক জুলিয়া কোর্তাজার পাৎস-এর কবিতা বিষয়ে লিখেছেন : 'অক্টাভিয়ো পাৎস দীর্ঘকাল ধরে এমন সব কবিতা রচনা করেছেন যা সর্বদাই নূতন দিগন্ত-দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। তাঁর ভাষা, সৌন্দর্য ও নিয়মানুরাগকে জারিত করে মেক্সিকোর নিজস্ব ছন্দহীনতার প্রলেপ রচনা করে।' তাঁর কাব্যপ্রবাহের মধ্যমণি লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে সার্থক প্রেমের কবিতা "বৈদূর্যমণি"। এই কবিতায় মানুষ এক এক নির্দিষ্ট তুরীয় অবস্থার মুখো-মুখি হয়, যাতে সব অলীক দিগন্ত মিলিয়ে যায়, যাতে মানুষ কেবলমাত্র পশ্চিমী ঐতিহাসিক আত্মন্তরিতায় পরিণত না হয়। পক্ষান্তরে, বিপুল-সংখ্যক পরিত্যক্ত, ভুলে-যাওয়া ঐশীশক্তির সঙ্গে পুনর্বার ভাববিনিময় হয়। ঐশী শক্তিসমূহের সৃষ্টি দেহ থেকে, সঙ্গীত থেকে, ভিয়েতনামের শিশুদের ক্রন্দনময় মুখমণ্ডল চুম্বনের আনন্দ থেকে। দেহ, দেহের চিরকালীন রহস্য, অনাবিষ্কৃত-আবিষ্কৃত রমণী-দের শরীর পাৎস-এর কবিতায় একাকার হয়ে যায় স্বদেশ, নগরী, অরণ্য, সমুদ্র ইত্যাদি পৃথিবীর মূল উপকরণগুলোর সঙ্গে। প্রতিছত্রে নারীর দেহ ও

মিলিয়ে দেয়। নারীই তাঁর কাছে ভাষার স্বরূপ, যা অমোঘ, যা শরীরী উদ্‌ঘাটন। যে কথা আন্দ্রে ব্রেতোঁও বারংবার নিবেদন করেছেন নানা কবিতায়।

ভাষা বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা তাঁকে সর্বদা আপ্লুত করে রেখেছে। অন্য একটা রচনায় লিখছেন, 'আমরা যা কিছুর নাম উচ্চারণ করি না কেন, তাই প্রবেশ করবে ভাষার গণ্ডির ভেতর এবং সেই কারণেই অর্থময়তার গণ্ডির ভেতরেও প্রবেশ করতে বাধ্য। এই পৃথিবীটাই নানা গূঢ়ার্থের এক পরিমণ্ডল, এক ভাষার পরিমণ্ডল। অথচ প্রতিটি শব্দের রয়েছে বিশিষ্ট অর্থ, যা অন্যসব শব্দের থেকে পৃথক ও বিরোধী। অর্থসমূহ নিজেদের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত, একে অন্যকে নিরর্থক করে দেয়, একে অন্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। সুতরাং 'সবকিছুই অর্থবহ কারণ তা ভাষারই অংশবিশেষ'– এই বক্তব্যটিকে ঘুরিয়েও উপস্থাপনা করা যায়—'কোনো কিছুই অর্থময় হতে পারে না যেহেতু সবকিছুই বস্তুত ভাষা'।' অথচ কোনো একজন কবির উপাদান কেবলমাত্র—শব্দ। যার প্রত্যেকটির একটা নিজস্ব অর্থ রয়েছে—এবং এইসব শব্দ দিয়েই কবিকে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি করতে হবে। কবির ব্যবহারযোগ্য শব্দাবলীও তো ভাষা অথচ এইসঙ্গে সেসব শব্দ বহন করছে অন্য একটি দ্যোতনা, যাকে বলি কবিতা। যা এর পূর্বে কখনো শ্রুত হয় নাই, কখনো স্পৃষ্টও হয় নাই। অর্থাৎ এমন একটা কিছু যা বস্তুত ভাষা অথচ যুগপৎ যা ভাষার বিরোধীও—কিন্তু তাই পৌঁছে দেয় ভাষার সীমানার ওপারে।

কবি শব্দসমূহ এমনি লীলায় ব্যবহার করেন যার তুলনা চলে একজন বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে দেহকোষ, অণু ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারের সঙ্গে। বিজ্ঞানী এইসব উপাদান প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আহরণ করেন, তেমনি কবিও তাঁর উপাদান চয়ন করেন প্রাত্যহিক ভাষা থেকে। উভয়েই তাঁর উপাদান এক শূন্য প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে বিশ্লিষ্ট করেন, বিযুক্ত বা যুক্ত করেন আর তারপর সেই পরিশীলিত উপাদানই গড়ে তুলতে সাহায্য করে তাঁর সৃষ্টি।

আমরা এখানে পাৎস-এর কয়েকটি কবিতার ভাষান্তর নিবেদন করে পাঠকদের তাঁর কাব্য বিষয়ে আরো খানিকটা আগ্রহের সঞ্চার করতে প্রয়াস পেয়েছি।

হুমায়ুনের সমাধি

মৌমাছিদের গুনগুন
বানরকুলের অস্তি-নাস্তির কুটকচালি
পরিসংখ্যার কিচিরমিচির
বিরোধিতা-নিমগ্ন এ
(গোলাপের দীপ্যমান শিখা
পাথর, বাতাস আর পাখি থেকে নিয়েছে আকার
জলের উপর মহাকাল আছেন শায়িত)
নৈঃশব্দের স্মরণস্থাপত্য

—

স্থিতিকাল

১ আকাশ মসীমাখানো
হরিদ্রাভ পৃথ্বি
মোরগের চিৎকার রাত্রি ছিঁড়ে করেছে টুকরো
জেগে উঠে অম্বু শুধায় বাজিল ক'টা
জেগে উঠে বায়ু শুধায় তোমার কী খবর
চ'লে যায় এক শ্বেত অশ্ব

২ যেমন ঘুমায় বনস্থলী পাতার শয্যায়
ঘুমাও তুমিও তোমার বৃষ্টির স্নিগ্ধ শয্যায়
বাতাসের বিছানায় গাও তুমি গান
স্ফুলিঙ্গের বিছানায় হও চুম্বনে অধীর

৩ বহুল প্রবল গন্ধ
বহুবাহু শরীরের
অদৃশ্য শাখায় কেবল একক
নিবিষ্ট শুভ্রতা

৪ কথা কও শোনো করো আমাকে উত্তর
বজ্র-করতালি কী-যে
কয়, কেবল বনানী
বোঝে তাহা

৫ কবি প্রবেশ তোমার দুটি চোখ দিয়ে
তুমি আস আমার মুখের মধ্য থেকে
আমার শোণিতে তোমার নিদ্রা
জেগে উঠি তোমার মস্তকে

৬ কবি আলাপচারিতা প্রস্তরের ভাষায় তোমার সাথে
(উত্তর দেবে তো দিও সবুজ শব্দেই)
কবি আলাপচারিতা তুষারের ভাষায় তোমার সাথে
(উত্তর দেবে তো দিও মৌমাছির পাখশাটে)
কবি আলাপচারিতা জলের ভাষায় তোমারই সাথে
(উত্তর দেবে তো দিও বজ্রের সালতিতে)
কবি আলাপচারিতা শোণিতের ভাষায় তোমার সাথে
(উত্তর দেবে তো দিও পাখিদের মিনারের চূড়া থেকে)

—

দৈববাণী

রাত্রির শীতল ওষ্ঠ
করে উচ্চারণ একটি শব্দ
বেদনার স্তম্ভ
শব্দ নয় কেবল প্রস্তর
প্রস্তরও নয় কেবলই ছায়া
বাষ্পীয় ভাবনা
আমার বাষ্পীয় ওষ্ঠের যথার্থ তরলতা দিয়ে
শব্দাবলী সত্যগর্ভ
আমার ভ্রান্তির পশ্চাতের কারণসমূহ
যদি তাহা মৃত্যু হয় তবে তারি মধ্যে বাঁচি আমি
যদি তাহা হয় নির্জনতা তবে তারি সেবায় প্রকাশ হয় বাণী
যদি তাহা হয় স্মৃতি তবে আমার স্মরণে নাই কিছু আর
জানা নেই আমার সেসব শব্দের বাস্তব মানে
যদিও তারই থাকি অনুগামী
কী ক'রে মানুষ জানে জীবনধারণ সত্য কিনা
কী ক'রে মানুষ ভোলে তার যাহা কিছু ছিল অধিগত
সময় যা করে অর্ধ উন্মীলন চোখের পল্লব
দেখে আমাদের, নিজেকে চোখের দৃষ্টিতে ক'রে প্রকাশিত

—

ভূদৃশ্য

পাহাড় ও গিরিচূড়া,
যথেষ্ট অধিক পাথরের তুলনায়, এই
সময়বিহীন বস্তুসব।

এরই শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন থেকে
গতিহীন তবু ঝ'রে পড়ে
চিরায়ত কুমারী এ প্রস্রবণ।

অক্ষয় যা এইখানে রয়েছে নিশ্চল
প্রস্তরের উপর প্রস্তর,
রয়েছে প্রস্তর বায়ুর উপর।

চরাচর হয়েছে প্রতীয়মান
যথার্থ স্বরূপে : এক সূর্য
অচঞ্চল, অনেক গভীরে।

মস্তক ঘুরে যাওয়া পরিমাপ;
গিরিচূড়া করে তৌল
আমাদের ছায়াদের চেয়ে নয় তা অধিক।

—

মাদুরাই

ব্রিটিশ ক্লাবের পানশালায়
—নরমপানীয়, অভাব কেবল সাহেবসুবোর—
'এ শহর আমাদের অতীব পবিত্র ফলে দক্ষিণা সামান্য বেশি'
বললেন তিনি,
কমলার রস পাত্র থেকে শুষে নিতে নিতে,
'ভারতবর্ষের বৃহত্তম দেবালয় দর্শনীয় এ-শহরে'

(মীনাক্ষি, দারুচিনি দেবী ;)
‘তৎসহ টি. এস. ভি. গারাজ,
(আপনার দুই চোখ যেন মৎস্যযুগল)
‘এই ভূখণ্ডে অবশ্য এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ;’
শ্রী কে. জে. চিদাম্বরম,
‘অধীন রয়েছে যুক্ত উক্ত দুই প্রতিষ্ঠানে।’
দি গ্রেট লিঙ্কম ইঙ্ক এর পরিচালক,
এক পরিবহণ সংস্থা ভ্রমণবাণিজ্যে পারঙ্গম।

—

গ্রাম

প্রস্তরসমূহ বস্তুত মহাকাল
বহতা বাতাস
কতো না শতাব্দী জুড়ে বাতাসের আয়ু
বস্তুত বৃক্ষসকল মহাকাল
অধিবাসী যতো তারাও পাথর
বহতা বাতাস
পেছনে ফেরে আপন বেগে এবং তলায়
প্রস্তরের দিবসের মাঝখানে
তার দুচোখের যাবতীয় ঔজ্জ্বল্যের প্রয়োজনে নেই কোনো জল

—

মতামত

১

‘সাম্প্রদায়িক শব্দটির প্রতি আমার প্রবল ঘৃণা’

অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, আপনার পত্রিকার মে, জুন, জুলাই, অগস্ট (১৯৯০) সংখ্যায় বন্ধু দিব্যজ্যোতি মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রিয় লেখক মুস্তাফা সিরাজের বিতর্কে, অবাঞ্ছিত ভ্রান্তিতে আমার নাম ব্যবহৃত হয়েছে। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে শিক্ষকতা করি। আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে ১৯৭৮ থেকে ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে, “মুর্শিদাবাদ জেলার বস্তুবাদী মুসলমান বাউল সম্প্রদায়ের সমাজ, দর্শন ও সাহিত্য” বিষয়ে গবেষণা শুরু করে, ১৯৮৫-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি পাই।

সাম্প্রদায়িক বিভাগ এবং ধর্মাচার না মানার জন্য হিন্দু এবং মুসলমান বাউলদের উপর এ জেলায় অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালে নওদা থানায়। মুসলমান সমাজের শরীয়ত-মারেফতের দ্বন্দ্ব এবং এই সামাজিক অত্যাচারের বিশ্লেষণ আমার গবেষণার অন্তর্গত ছিল। এর পেছনে এক জটিল আর্থ-সামাজিক কারণ, দরিদ্রদের উপর উচ্চবর্গের সংস্কৃতি আরোপের আকাঙ্ক্ষা, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অস্তিত্ব হারানোর ভয় প্রভৃতি নানা কারণ সক্রিয়। এ নিয়ে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৮১-র পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় এ জেলার সামাজিক অত্যাচার, স্থান, কাল, পাত্রপাত্রীদের নাম ও রাজনৈতিক পরিচয় দিয়ে এক দীর্ঘ লেখা (২১শে সেপটেমবর) প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী-সম্পাদিত “মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা” পত্রিকায় ৫ই, ২০শে জানুয়ারি এবং ৫ই সেপটেমবর ১৯৮৩-তে তিনটি লেখায় মুসলমান বাউলদের উপর সামাজিক অত্যাচার ও তার কারণ বিশ্লেষিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তের মাড়গ্রামে সঙ্কিগড়ার গুরু জব্বারের শিষ্য সাত ভাইকে গান করার অভিযোগে ঘরে আগুন দিয়ে অতঃপর গলাকেটে হত্যা করা হয়। বিষয়টি নিয়ে “মুণ্ডহীন ধড়গুলি আর্তনাদ করে” নামে এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় বহরমপুর থেকে প্রকাশিত “জনমত” (১৯৮৩, ৬ই মার্চ) ও করিমপুর থেকে প্রকাশিত “পল্লীর কণ্ঠস্বরে” (৮ই মার্চ, ঐ)। মহাশ্বেতা দেবী নিহত সাত ভাই-এর মা আনোয়ারা খাতুনের টিপসইদেয়া এক আবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীর কাছে প্রতিবিধানের জন্য ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে জব্বার সাহেবের দশ হাজার শিষ্য রামপুরহাটে এক নীরব শোক-মিছিল করে এর প্রতিবাদ জানায়। কলকাতার বিখ্যাত কাগজে নিম্নবর্গের এ-সমস্ত খবর থাকে না।

নওদা থানার দুর্লভপুর গ্রামে গান করার অপরাধে খেতমজুর লতিফ শেখকে ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা বর্শা দিয়ে মাটিতে গেঁথে রাখে। পুলিস গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। অত্যাচারের বিষয়টি “আজকাল” পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হয় ; এ নিয়ে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনও লেখা হয়েছিল। জেলাশাসক প্রদীপ ভট্টাচার্য সে সময় এ নিয়ে এক সর্বদলীয় সভা আহ্বান করেছিলেন। এই অমানবীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় “বর্তমান” পত্রিকায় ধর্মান্ধ মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এক নিবন্ধ লেখেন।

এই সামাজিক অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে নদীয়া-মুর্শিদাবাদের বাউল-ফকিররা বহরমপুর শহরে বিরাট মিছিল করেন। তাঁরা “বাউল ফকির সঙ্ঘ”

নামে রেজিষ্ট্রি করেন এক সংগঠন। ধর্মান্ধদের ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বহু অত্যাচারের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশাসনিক সাহায্য করে অত্যাচার প্রশমিত করেন। অন্তত দুটি জায়গা—দুর্লভপুর ও সারগাছিতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করেছিল। পূর্বকথিত বাউল ফকির সঙ্ঘের সদস্যসংখ্যা প্রায় হাজার। প্রতি বছর সংগঠনের সম্মেলন হয়; সেই উপলক্ষে মুদ্রিত আবেদনপত্রের প্রচারিত হয়। দিব্যজ্যোতি এ ধরনের আবেদনপত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রতি বছর ধর্মীয় নিপীড়নের, জোর করে গান বন্ধ করে দেবার বহু ঘটনার মোকাবিলা বাউল ফকির সঙ্ঘ করে। জেলার প্রশাসন, তথ্য-সাংস্কৃতিক দপ্তর, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা ধর্মান্ধদের বাউল-বিরোধী অভিযানের তথ্যাদি জানেন। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতি ইঞ্চি জমি চিনি না, সমস্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি বোঝার মতো ক্ষমতাও নেই আমার। ঘটনাক্রমে বাউল ফকির সঙ্ঘের আমি সভাপতি। নদীয়া-মুর্শিদাবাদের কয়েক হাজার বাউল-ফকিরকে আমি চিনি এবং তাঁদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করি।

আউল-বাউল-ফকিরদের বাইরেও হিন্দু বা ইসলামি সমাজে বহুসংখ্যক মানুষ নেশা করে বা অবৈধ প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন করে—তারা কখনও মৌলবাদীদের দ্বারা পিষ্ট হয় না। আমাদের দেশে ধর্মান্ধ রক্ষণশীলগণ চিরকাল উদারতাবাদীদের বিরোধিতা করেছে। বাউল ধ্বংসের আন্দোলন বঙ্গীয় সমাজে বেশ পুরনো। নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আকর-গ্রন্থ হিসাবে আমরা "বাউল ধ্বংস ফৎওয়া" গ্রন্থটিকে স্মরণ করতে পারি। এ দ্বন্দ্বের ও রক্তাক্ত সংঘর্ষের ইতিহাস পাই Dr. S. A. A. Rizvi-র প্রখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ Muslim revivalist movement in the northern India in the 16th and 17th centuries (1965)-এ। বেসরা সুফীরা, গায়ক, বাদক, চিত্রকরেরা এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মানুষ দ্বারা অতি প্রাচীনকাল থেকেই লাঞ্ছিত হয়ে আসছেন। সারমাদ নিহত হয়েছিলেন; সুরাবরদির স্কন্ধ উন্মোচিত হয়েছিল; লালনের গানে উল্লিখিত হয়েছে মনসুর হাল্লাজের কথা; তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

১৯৭১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে মুর্শিদাবাদ-নদীয়ায় মৌলবাদীরা কেন্দ্রীয়ভাবে মুসলমান সমাজ-ভুক্ত বাউল-ফকিরদের উপর অত্যাচার পরিচালনা করছে। পূর্ব যুগের ধর্মান্ধদের সঙ্গে এদের বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। আধুনিক মৌলবাদ এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়। কখনো ইসলামি, কখনো খ্রীষ্টানি, কখনো হিন্দু বেশে সে আবির্ভূত হয়। জনগণের স্থানীয় সমস্যা ও অবৈর দ্বন্দ্ব থেকে এর জন্ম হয় না। আজকের রূপান্তরিত মৌলবাদ আসে উপর থেকে; কেন্দ্রীয় সংগঠিত রূপে, বহিরাগতদের দ্বারা বাহিত হয়ে। বর্তমানের মৌলবাদ এক প্রবল রাজনীতি, যা জনগণের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ঐক্যে সংগঠিত করে। তারা সাম্প্রদায়িক ভিন্নতাকে গুরুত্ব দিয়ে, ধর্মীয় বিভেদকে প্রসারিত করে। যে-সমস্ত বাউল ফকির রোজা পুজা মানে না, হিন্দুমুসলমানে একত্র হয়, হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে নিজেদের সামাজিক পরিচয় দিতে অস্বীকার করে (বলে আমরা মানুষ), তারা আজকের মৌলবাদ প্রসারের প্রবল প্রতিবন্ধক। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রবক্তা বাউল-ফকিরগণ তাই আজ প্রবলভাবে মৌল-বাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। নদীয়া-মুর্শিদাবাদে নানাভাবে সতত তাঁরা পিষ্ট ও অত্যাচারিত হচ্ছেন। এগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ তথ্য। কে এগুলি জানেন বা না জানেন, তার উপর সামাজিক তথ্যের সত্যতা নির্ভর করে না।

ব্যক্তিগতভাবে মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে আমি পরিচিত নই। তাঁর পিতা, ভাই নৌমান এবং ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আমার অপরিচিত নন এবং ফিরদৌসী সাহেবের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করার জন্য আমি

খোসবাসপুরে গেছি। না, পুরন্দরপুরে কংগ্রেস এম. এল.এ-র আহ্বানে কখনো পাঠাগার উদ্বোধনে আমি যাইনি। সুতরাং রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিশেষণ-গুলি আমার প্রাপ্য নয়। যাকে চেনেন না তাকে এ বিশেষণের উপহার সঙ্গত কি?

বন্ধু দিব্যজ্যোতি ভ্রমক্রমে 'মুসলমান চাঁই' শব্দ ব্যবহার করে ফেলেছেন। চাঁইরা মূলত হিন্দু সমাজ-ভুক্ত। কিন্তু এ জেলার হরিহরপাড়া-নওদা সীমান্তের গ্রাম গঙ্গাধারীতে 'মুসলমান চাঁই' বলে ছোট একটি গোষ্ঠী আছে। অনতিপূর্ব কালে ধর্মান্তরিত চাঁইদের উত্তরপুরুষ এঁরা। বর্তমানে শেখদের সঙ্গে এঁদের বিবাহ হয়। এঁরা ধর্মান্ধ বা অত্যাচারী নন। প্রয়োজনবোধে এই তথ্য তদন্ত করে নেয়া যায়।

নদীয়া-মুর্শিদাবাদে ধর্মান্ধতা এবং হিন্দু ও ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে লেখায় ও আলোচনায় সাধ্যমত প্রতিবাদ করি বলেই সাম্প্রদায়িক শব্দটির প্রতি আমার প্রবল ঘৃণা। সিরাজের পরিবারের বা আমাদের বহু পরিচিতদের মধ্যে তিনি আমাকে সাম্প্রদায়িক বলার কোনো সমর্থন পাবেন কি? তাঁর "তৃণভূমি" উপন্যাস, "গোঘ্ন" গল্প এবং ধর্মকে 'কুষ্ঠ-ব্যাধি' আখ্যা দেওয়ায় আমি পাঠক হিসাবে তাঁর 'কেনা' হয়ে গেছি। সুতরাং তাঁর অযৌক্তিক মন্তব্য-গুলির বিরুদ্ধে আমার অন্যতম প্রিয় লেখকের বিবেকের কাছেই আমি মুস্তাফা সিরাজকে অভিযুক্ত করছি।

শক্তিনাথ ঝা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

২

ভারতে গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয়

জুন ১৯৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার চিঠি শ্রদ্ধেয় আহমদ শরীফ সাহেবের এপ্রিলের প্রবন্ধের দুটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে:

১. ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ইংরেজ সাহেবদেরই অবদান, এবং ২. সেক্যুলার ভারতে গোবধ বন্ধ করা হয়েছে। প্রথম বক্তব্যটি সম্বন্ধে আমি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। শ্রদ্ধেয় ওদুদ সাহেবের রচনা থেকে "সিয়ারুল্ খোতা আখেরীন"-এ বর্ণিত প্রাক্-ইংরেজ যুগের দুটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলাম। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে বলে-ছিলাম যে ভারতে গোবধ নিষিদ্ধ—এই ধারণা ভুল।

বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সাহেব আমার বক্তব্য খণ্ডনের জন্য দীর্ঘ পত্র রচনার শ্রম স্বীকার করেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ, তা তাঁর বক্তব্যের গোড়াতেই আমার 'বিভ্রান্তি' দেখতে পেলেও। কারণ, এই প্রসঙ্গে তিনি আমাকে ওদুদ সাহেবের মতো মনীষীর সমগোত্রে উন্নীত করেছেন। "সিয়ারুল্ খোতা' আখেরীন"-এ বর্ণিত ঘটনা দুটির সত্যতা সিরাজ সাহেব অস্বীকার করেন নি, লেখকের কুলবিচারে যাই দাঁড়াক না কেন, ঘটনা দুটির একটি ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, এবং তা হল ও-দুটি 'বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ', সুতরাং এর পর এ সম্বন্ধে আর বিস্তারিত বক্তব্যের প্রয়োজন থাকে না। জীবনের চল্লিশ বৎসরেরও দীর্ঘ-কাল আমাকে মুসলমান দরজি আর বয়ন-শিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে হয়েছে, এবং এখনও হচ্ছে বলে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমার 'জ্ঞাতার্থে' সিরাজ সাহেবের বিস্তারিত নিবেদন বাহুল্য মাত্র মনে হয়, চতুরঙ্গের অধিকাংশ পাঠকের কাছেও তাঁর বক্তব্যের ওই অংশ অনুরূপ মনে হয়েছে। সিরাজ সাহেবের মতো আমিও ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ধারায় বিশ্বাসী এবং তাই স্বভাবতই তাঁর বক্তব্যের ওই অংশের প্রবল সমর্থক। সীমিত কর্মক্ষমতা ও কলমের শক্তির সাহায্যে আমি এই বাণী প্রচারেরই কাজ করে আসছি।

'পশ্চিম বঙ্গ, কাশ্মীর, গোয়া ও কেরল বাদে ভারতের সমস্ত রাজ্যে গোহত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ'—

সিরাজ সাহেবের এই স্বীকৃতি আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, অর্থাৎ ভারতে গোবধ নিষিদ্ধ নয়,—এর সমর্থক। কারণ ওই রাজ্যগুলি ভারতেরই অঙ্গ। তা ছাড়া, লোকসভায় গত ১৭ই অগস্ট শ্রীলোধার ভারতে গোহত্যা বন্ধ করার বিলের উপর বিতর্ক, আর তা ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়াও প্রমাণ করে যে এদেশে গোহত্যা হয়, অতএব এর পর তাঁর বা আমার পক্ষে আর কথা বাড়াবার যুক্তি থাকা উচিত নয়। তাই অপ্রয়োজনীয় বিধায় তাঁর উত্থাপিত অন্য প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বিরত থাকলাম।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
"চারু নীড়" কামড়হরি—
গড়িয়া, কলিকাতা-৮৪

৩

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"

মে মাসের "চতুরঙ্গ"-তে 'সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি' বিভাগে শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার তাঁর 'নিজ ধর্মের মানুষের প্রতিও বিদ্বেষের ঐতিহ্য বহন করে প্রতিটি ধর্ম' শিরোনামের লেখাতে খুবই সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে ওই রচনার গোটা দুই খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে আমার সামান্য কিছু বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখে জানাচ্ছি।

(১) দিব্যজ্যোতিবাবু হিন্দুধর্মের এবং ইসলাম-ধর্মের দুটোর মধ্যেই নানা বিরোধী গোষ্ঠীর কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু হিন্দু আর ইসলাম ধর্মাবলম্বী-দের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ, সহনশীলতার অভাবের কথা তেমন স্পষ্ট করে বলেন নি। ফলে এ ধারণা বদ্ধমূল হতে পারে যে ইংরেজ শাসকরাই ওই বিদ্বেষ-বিরোধের সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের এদেশে রাজত্বকালের আগেই যে ওই বিদ্বেষ-বিরোধ ছিল সেটা বোধ হয় মওলানা মহম্মদ আলীর গুটিকয় কথায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই ধরা পড়ে। তিনি বিদেশী শাসকদের উদ্দেশ করেই বলেছিলেন : 'We divide and you rule'। তিনি 'you divide…' এ কথা বলেন নি। তবে বিদেশী শাসকরা নিজ স্বার্থে স্বাভাবিকভাবেই এই বিরোধটাকে উশকে দিয়েছিলেন।

(২) দিব্যজ্যোতিবাবু শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের মন্ত্রাংশ "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" কথা কটি একাধিকবার (পৃষ্ঠা ৫৩) ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে —'এই বিশ্বে আমরা সকলে(ই) অমৃতের পুত্র'। এই ব্যাখ্যাতে গোটা দুই বিভ্রান্তি আছে মনে হয়। প্রথমত, 'বিশ্বে' এই শব্দটির এখানে 'জগতে' এই অর্থ করা চলে না। এখানে 'সকল, সমস্ত' এই অর্থে 'বিশ্বে' সম্বোধনের বহুবচনের রূপ (বিশ্বঃ / বিশ্বো / বিশ্বে, সর্বনাম সর্ব শব্দের মতো) যেটা ব্যবহৃত হয়েছে 'পুত্রাঃ' এই বহুবচন শব্দটি সম্পর্কে অর্থাৎ 'বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—এর অর্থ 'সমস্ত অমৃতের পুত্র'। দ্বিতীয় বিভ্রান্তি এটা মনে করা যে 'বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' কথাটি সমস্ত মানুষকে উদ্দেশ করেই বলা হয়েছে। তা যে বলা হয় নি সেটা 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' কথাগুলোর ঠিক পরেই মূল উপনিষদে যে কথাগুলো আছে তা থেকেই ধরা পড়ে। পুরো মন্ত্রাংশটি এই—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধা মানি দিব্যানি তস্থুঃ' অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষ সাধনার বলে অমৃতত্ব লাভ করে বা 'অমৃতের পুত্র' পর্যায়ে উঠে দিব্যধামে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদের সকলকেই শুধু সম্বোধন করে উপনিষদকার তাঁর কথাগুলো বলেছেন, সকল মানুষকে সম্বোধন করে নয়। তবে উপনিষদের দিক থেকে সকল মানুষই 'সম্ভাবনা'য় ('in posse') অমৃতের পুত্র, যদিও বাস্তবে ('in esse') তাঁরা সবাই সে পর্যায়ে উঠতে পারেন না—কথাটা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

এ আলোচনায় 'বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' কথা-গুলোর সঠিক ব্যাখ্যা ছাড়াও আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য প্রায় অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। অনেক সময়ই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের (আকাশ-বাণী এবং দূরদর্শন মারফত প্রচারিত অনুষ্ঠানেরও) সূচনায় উপনিষদের মন্ত্র হিসেবে আবৃত্তির বা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সঙ্গীতের মাধ্যমে যে দুই মন্ত্রাংশ এক করে পরিবেশিত হয়ে থাকে সেগুলো এই—

(১) শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ এবং (২) 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' এর থেকে মনে হবে যে উপনিষদকার ঋষি 'শৃণ্বন্তু' ('শোনো') বলে এখানে একথাটাই শুনতে বলেছেন যে তিনি এই আদিত্য-বর্ণ মহান পুরুষকে জেনেছেন। কিন্তু মূল উপনিষদে (শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ) প্রথম পংক্তি ('শৃণ্বন্তু বিশ্বে……') ওই উপনিষদের **দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্রের শেষাংশ**; অন্যদিকে এই মন্ত্রটি থেকে উনিশটি মন্ত্র পরের যে মন্ত্র অর্থাৎ **তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্র তার প্রথমাংশটি** হচ্ছে 'বেদাহমেতম্…'; অথচ এ দুটি এক করে ব্যবহারে অসঙ্গতিটি ধরা পড়ে না; মনে হয় প্রথম পংক্তির ('শৃণ্বন্তু…') পর স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয় পংক্তি ('বেদাহমেতম্…') এসেছে। মূল উপনিষদে নেই এমন একটি অভিনব মন্ত্র কিভাবে সৃষ্ট হল স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন জাগে। উত্তরের একটি সূত্র এরকম হতে পারে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "ব্রাহ্মধর্মঃ" নামের সংকলনগ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে এই দুটি মন্ত্রাংশ ঠিক পর-পর উদ্ধৃত করেছেন—**দ্বাদশ** উদ্ধৃতিটি—**'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ'** এবং **ত্রয়োদশ** উদ্ধৃতিটি—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'। ঠিক পর-পর এ দুটি মন্ত্রাংশের উদ্ধৃতি থেকে এ বিভ্রান্তির সূত্রপাত হতে পারে যে মূল উপনিষদে এরা ওভাবেই আছে। অধিকন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রথম উদ্বৃতিটির ('শৃণ্বন্তু বিশ্বে …') সরলার্থ নিখুঁতভাবে ('হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল') দিলেও ঠিক তার পরেই ব্যাখ্যাতে লিখেছেন—'শ্রবণ কর : আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি'। এ ব্যাখ্যা থেকে পাঠকের মনে এ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতেই পারে যে উপনিষদের ঋষি 'শৃণ্বন্তু' বলে বেদাহমেতং ……' —এ কথাই মূল উপনিষদে বলেছিলেন,—যেটা অবশ্যই ঠিক নয়। দুটি বিভিন্ন মন্ত্রাংশ এভাবেই এক হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। এমনকী রবীন্দ্রনাথও তাঁর লেখার কোনো-কোনো জায়গায় যেমন তাঁর "শান্তিনিকেতন" নামের গ্রন্থে ('নবযুগের উৎসব', "অমৃতের পুত্র"—রচনাগুলোতে) ওই দুই বিচ্ছিন্ন মন্ত্রাংশকে এক করে ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা করেছেন যার ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে জিনিসটি সহজেই গ্রহণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পরিবেশিত হয়েও চলেছে।

কল্যাণকুমার দত্ত
বি ১১/২০ কল্যাণী
নদীয়া

চতুরঙ্গ আগস্ট ১৯৯০ সুনীল সেনের "কমিউনিস্ট ডুনিয়ায় আলোড়ন ও সমাজবাদের ভবিষ্যৎ" নিবন্ধ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য প্রকাশের জন্য আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন অরুণশঙ্কর দাস। রচনাটি অকটোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হল বলে ওই সংখ্যার প্রচ্ছদ-বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছিল। অনিবার্য কারণে সেটি প্রকাশ করা যায় নি। রচনাটি ডিসেম্বর ১৯৯০ সংখ্যায় অবশ্যই প্রকাশিত হবে।